প্রকাশ

প্রথম খন্ড

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অখন্ড মহাপীঠ

(শ্রীশ্রীমায়ের রচনা সংকলন)

প্রথম খণ্ড

প্রকাশক ঃ
মাতা সর্বাণী ট্রাস্ট (ইং ১৯৯৬ সন)
"অখণ্ড মহাপীঠ"
প্লাজা হাউসিং
গ্রাম ঃ জগন্নাথপুর (শিবরামপুর)
পোস্ট ঃ আশুতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
পিন ঃ ৭৪৩৩৫২

প্রথম সংস্করণ ঃ
গুরু পূর্ণিমা
২৪শে জুলাই, ২০০২

মূল্য ঃ ৪০.০০

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১) *সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার*
৩৮, বিধান সরণী,
কলকাতা-৭০০০০৬
২) *সর্ব্বোদয় বুক স্টল*
হাওড়া ষ্টেশন (ওল্ড কম্‌প্লেকস্)
হাওড়া-৭১১১০১
৩) *নবভারত পাবলিশার্স*
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯
৪) *জয় গুরু পুস্তকালয়*
১২১/১/বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

উৎসর্গ

মম হৃদি মন্দিরে বিরাজে—
অনাদি আদি কাল হতে যে অস্তিত্বের পরশ,
তাঁরই শ্রীচরণে দিই মোর প্রেমপূর্ণ অঞ্জলি।।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

সচ্চিদানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।"

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ঈশ্বর অন্বেষণ

সম্মুখে একটি সুবিশাল নাট্যশালা দণ্ডায়মান; আমি নির্দ্বিধায় সেই নাট্যশালায় প্রবেশ করিলাম। তথায় কেবলমাত্র একটি লোক আমাকে আমার নির্দিষ্ট আসন দেখাইয়া দিলেন। আমি আসনে উপবেশন করিবামাত্রই কক্ষের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। লোকটি আমাকে বলিলেন—"এখনই নাটক আরম্ভ হবে।"

আমি—"আর সব লোকজন কই?"

লোকটি—"এ নাটক দেখার জন্যে অধিকার লাভ করতে হয়; তাই বসার seat অনেক আছে কিন্তু অধিকারী নেই। তুমিই এখন একজন। চল ঐ ওখানে তোমার আসন।

লোকটি আমায় প্রথম সারিতে সব চাইতে ভাল জায়গায় বসিতে আদেশ দিলেন। তাহার আদেশানুযায়ী আমি বসিলাম।

আমি—"নাটক শুরু হতে আর কতক্ষণ?"

লোকটি—"এখনই শুরু হবে।" ব্যাস! নাট্যকক্ষের আলোক সব দপ্ করিয়া নিভিয়া অন্ধকার হইয়া গেল, আর সম্মুখের দৃশ্যমান নাট্য মঞ্চের আলো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেখিলাম যে, যে লোকটি আমায় auditorium-এ প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন তিনিই হইলেন নাটকের নায়ক!! লোকটির পরনে Red Robe (লালবেশ); জাতিতে সাহেব বলিয়াই বোধ হইল। সে কি যেন অন্বেষণ করিতেছে, তাই তাহাকে অস্থির বলিয়াই মনে হইল। এমন সময় শুভ্রবেশ বা White Robe পরিধৃত এক বৃদ্ধ, তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে দুখানি শ্বেত বর্ণের উন্মুক্ত ডানা (wings) রহিয়াছে; তিনি জ্যোতির্ময় পুরুষ; প্রবীণ; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ লোকটির

দিকে অগ্রসর হইয়া প্রাচীন ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

লোকটি—"তুমি কে?"

বৃদ্ধ—"আমি ঈশ্বরের দূত। তুমি যা খুঁজছো তার সন্ধান আমার জানা আছে।"

লোকটি—"তোমার জানা আছে? বলতে পারো, ঈশ্বর কোথায় আছেন? আমি দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁরই খোঁজে অশান্ত চিত্তে দিন অতিবাহিত করছি। Please, দয়া করে তুমি আমায় এখনই নিয়ে চলো।"

বৃদ্ধ—"তবে এখনই এস, আমার সঙ্গে।"

দুজনে চলিতে লাগিল। অগ্রে বৃদ্ধ পশ্চাতে লোকটি। পৃথিবীর কত নদনদী, পাহাড় পর্বত, নগরনগরী ইত্যাদি সব স্থান পার হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে লোকটি দেখিল যে দুজনাতেই আকাশ পথে চলিয়াছেন। লোকটি আকাশ পথে যাইতে ভয় পাইল! বলিল—"তোমার মতো আমার তো ডানা নাই যে আমি আকাশে ভাসব।"

বৃদ্ধ—"তুমি আমার হাত ধরো, আমি তোমায় ঠিক তুলে নিয়ে যেতে পারব।"

লোকটি বৃদ্ধের প্রতি একবার তাকাইল এবং কি যেন ভাবিল। বৃদ্ধের স্থির অটল স্বচ্ছ দৃষ্টি লোকটির মনে অপরিসীম আস্থার সঞ্চার করিল। লোকটি বৃদ্ধের হাত ধরিল। তারপর শুধুমাত্র আকাশপথ— যেন অনন্ত পথ; শেষ আর হইতে চাহে না। চলিতে চলিতে লোকটি খুব ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধকে বলিল— "আর পারছি না; আর কতদূর? তুমি আমায় ভুল পথে নিয়ে এলে নাতো??"

বৃদ্ধ স্মিত মধুর হাস্যে লোকটির দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন—"ঐ দেখো— ঐ দূরে দুটি বিন্দু দেখা যাচ্ছে; ঐ ঈশ্বরের প্রাসাদের সিংহ দরজা; চলো, আমরা আর একটু এগোলেই পৌঁছে যাবো।"

তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন; দুইটা বিন্দু ক্রমশঃ রাজতোরণের

আকার ধারণ করিল। যতই সেই তোরণ দরজার কাছাকাছি যাইতে লাগিল, লোকটি দেখিল যে তোরণের দুটি থাম ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ দরজার ফাঁক বিশাল হইয়া যাইতেছে। লোকটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজতোরণের থামগুলিকে দেখ্‌ছ, কেমন্ যেন ক্রমশঃ দুটি সরে সরেই যাচ্ছে। এতো ভারী মুস্কিল!"

বৃদ্ধ—"ঈশ্বরের রাজতোরণ তো; তাই এমনই হয়। মায়ার মধ্যে দিয়ে দেখলে এমনই দেখবে। আসলে দরজা কখনও বন্ধ নয়। দূর হতে বন্ধ বলেই মনে হয়, কিন্তু দেখ, যত কাছে আসা যায় ততই বিরাট বিশাল!!!"—

লোকটি ও বৃদ্ধ এইবার যখন তোরণদ্বারের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন লোকটি দেখিল যে কোনও থামের প্রতিকৃতি বা চিহ্নমাত্র আর নেই। বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সে বলিল—"তোরণদরজার দুটি থাম গেল কোথায়?"

বৃদ্ধ—"অসীমে মিশে আছে।"

লোকটি—"তবে ঈশ্বর কোথায়? এখনও তো তাঁর দেখা পাওয়া গেল না?"

বৃদ্ধ চুপ রহিয়া অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলেন—"ঐ, ঐ যে ঈশ্বরের প্রাসাদ।" প্রাসাদে দুজনাই প্রবেশ করিলেন। বিশাল হল্ (Hall) ঘর। লাল কার্পেট পাতা রহিয়াছে। লম্বা পথের মতো লাল কার্পেট মাথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, তথায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া শুভ্র net-এর পরদার কুচিতে (pleat) ঘেরা জায়গাটি দেখা যাইতেছে মাত্র। লোকটি বৃদ্ধকে বলিল—"কই? শুধুতো পরদা দিয়া সব আবৃত; ঈশ্বরকে তো দেখতে পাচ্ছি না"।

বৃদ্ধ—"এগিয়ে যাও; ঐ তো ঐ সম্মুখের শ্বেত পরদাটা গিয়ে সরিয়ে দাও, দেখো ঈশ্বর ওখানেই সিংহাসনে বসে আছেন, তোমারই জন্যে, তোমারই অপেক্ষায়।"

লোকটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তিনটি সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া ঢাকা

পরদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তারপর আবার পিছন পানে চাহিল; দেখিল যে বৃদ্ধ নাই; কেহই নাই। তখন আবার সে একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল— এইবার তাহার দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল—"একবার নিজের চোখটা ভাল করে পরিষ্কার করে নাও। পর্দাটা সরাও, দেখো আমি তোমার সামনেই আছি।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৈববাণীর আজ্ঞানুসারে লোকটি যেমনি দুটো হাত দিয়া পরদাটি সরাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ দেখিল— অবিকল তারই অনুরূপ একজন ঈশ্বরের সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

পরমুহূর্তেই নাট্যমঞ্চের আলোক নিভিয়া গেল। উপরিউক্ত নাটক দর্শন করিয়া আমিও হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। আর অধিক কি?

(উপরিউক্ত কাহিনী আমার সাধনরত অবস্থার একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত)

নীলপাখি

সুবিশাল এক সজ্জিত ঘর; চতুর্দিকে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। কত দামী দামী সামগ্রীতে ঘরখানি সজ্জিত হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলল— কত অপূর্ব সব মানুষ, পুরুষ-নারী ও শিশুগণ সব দামী দামী বস্ত্র পরিধান পূর্বক ঘরে প্রবেশ করতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘরটি ভরে গেল। জনমানবপূর্ণ হল ঘর; তারপর কী অপূর্ব সঙ্গীতের ধ্বনি কানে এল। কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ সঙ্গীতের ধ্বনির তালে তালে আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে নৃত্য করতে লাগল। সকলেই নিজেদের মধ্যে তাহাদের আনন্দ উৎসব নিয়ে মেতে রয়েছে। এদের সকলের মাঝে হঠাৎ দর্শকের লক্ষ্য পড়ল একটা ছোট্ট অপূর্ব সুন্দর নীল পাখি, স্বভাবে আপন মনে কখনও লোকের মাঝে, কখনও নাচের জায়গায়, কখনও দামী দামী আসবাবের উপর ঘোরাফেরা করছে। সকল বস্তু ছাপিয়ে দর্শকের নীল পাখিটার প্রতি বড় লোভ পড়ল; দর্শকের সেই পাখিটা চাই-ই-চাই। পাখিটাকে দর্শক ধরতে গেল আর পাখিটা ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে যেখানে বসল সেটা হল একটা প্রকাণ্ড বড় খাবার টেবিল। তাতে কত রকম খাদ্য সামগ্রী সব সাজানো রয়েছে; নীল পাখিটা টেবিলে বসে পড়ল আর উল্লাসে আনন্দে সব খাদ্যসামগ্রী খেতে লাগল। দর্শকের কিন্তু ওসবের দিকে লক্ষ্য নেই; তার একমাত্র লক্ষ্য নীলপাখি। সে ওটাকে ধরতে এগিয়ে গেল; ফুরুৎ! পাখিটা উড়ে চলে গেল।

এইবার অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির কি অপূর্ব শোভা। একটা বিরাট সুন্দর বাগিচা। স্তরে স্তরে নানা বর্ণের, নানান প্রকারের সব ফুলের রাশি এক এক জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে সজ্জিত

হয়ে রয়েছে। নীলপাখিটা একবার এ ফুলের সাজিতে বসছে আবার খেলা করতে করতে অন্য ফলের গুচ্ছতে গিয়ে বসছে। চারদিক দিনের আলোয় উজ্জ্বল। দর্শক প্রথমে প্রাকৃতিক শোভাতেই মুগ্ধ হয়ে ছিল বেশ অনেকক্ষণ। কিছু সময়ের জন্য যেন সে নীল পাখিটার কথা ভুলে গেছে। কিন্তু হঠাৎ আবার নীল পাখিটা চোখে পড়তেই ওটাকে ধরার ইচ্ছা জাগল, দর্শকের মনে প্রবল ইচ্ছা হল; দৌড়ে ওটাকে ধরতে গেল। কিছুক্ষণ ভীষণ ছোটাছুটি ও চঞ্চলতায় কাটল কিন্তু পাখিটা আবারও ফুরুৎ!!——

এবার একটা প্রকাণ্ড বড় বড় বৃক্ষরাজি সুসজ্জিত ফলের বাগানে গিয়ে পড়ল দর্শক; দেখল, নীল পাখিটা ফলের বাগানে এগাছ ও গাছে বেড়াচ্ছে মনের সুখে; কিন্তু কোনও ফল সে খাচ্ছে না। পাখি তার নিজের ভাবে খেলায় নিমগ্ন। দর্শকের কিন্তু ফলের গাছে সব ফলমূলগুলি দেখে লোভ হচ্ছে; কিন্তু এইবার পাখির প্রতি দর্শকের লক্ষ্য অনড় হয়ে পড়তে চাইছে, তবুও দর্শন পাখির প্রতি একাগ্রতায় অটল হইল। দর্শকের মনের ভাব যেন "নীলপাখিকে হাতছাড়া না করি"। "ফলগুলি তো সব আছেই"। নীলপাখিকে ধরতে এগিয়ে গেল দর্শক। এবারও পারল না; উপরের উন্মুক্ত দিগন্তের বুকে পাখিটাকে আপন ঢঙ্গে মনের সুখে উড়তে দেখা গেল। দর্শক পাখির পিছু নিল; পাখিটা সম্মুখপানে নীল দিগন্তে আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল; পিছনে দর্শকও ধাবমানা; তারপর!! হঠাৎ!! সামনের আকাশটা ফেটে দুফাঁক হয়ে গেল। নীল পাখি আকাশের ফাটল দিয়ে ঢুকে গেল। দর্শকও পাখিকে অনুসরণ করতঃ আকাশের ফাটল দিয়ে ঢুকে পড়ে দেখল——এক জ্যোতির্ময় আকাশ; নীল পাখি আর নেই; দর্শক দেখল যে সে নিজেই একটা নীল পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তখন, শুধু বিস্ময়! বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা। কিন্তু দর্শকের মনে বিকার বুদ্ধি এল না। নীল পাখি হয়ে মহাসুখে ডানা মেলে সে আকাশের বুকে ভেসে বেড়াতে লাগল। তারপর হঠাৎ সব শূন্যাবস্থা হয়ে গেল!!!

আকাশটায় লেখা ফুটে উঠল—

P	URIFIED
E	TERNAL
A	LMIGHTY
C	ONCIOUSNESS
E	NDLESS

এই পাঁচটা শব্দ একের পর এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মত জ্যোতিঃ অক্ষরে পাশাপাশি লিখিত হয়ে পড়ল খুব দ্রুত।

এই কি শান্তি? না হয় প্রশান্তি অর্থাৎ "প্রকৃত শান্তি" আত্মসত্তার এক অটল অক্ষয় স্থির শান্ত অবস্থা!!!

উপরে লিখিত ছোট্ট গল্পটি আত্মদর্শনের অনবদ্য এক রূপক গল্পমাত্র।

গল্পের "পরিশিষ্ট"

ঘটাকাশে উদ্ভাসে, চেতন-অবচেতনের রূপেরই মতন নিদ্রিত সত্তা জাগৃত নয়নে দেখে,

চলচ্চিত্রাকারা প্রতিবিম্বিত স্বপন ॥
মায়ার ঝলকে সৃষ্টি নবীন
চির নব অন্তর বহিরঙ্গেরই স্বপ্ন
দৃশ্যমান জগৎ পারাবার
স্বপ্ন-সত্য-বাস্তবে নিমগ্ন ॥— স্বপ্ন —শ্রীশ্রীমা

শূন্য হতে মহাশূন্য যেন অসীম অন্তহীন দিশা
অকস্মাৎ মহাশূন্য ভেদী দেখা যায় আলোর নিশা ॥
ইচ্ছারূপ সত্তা মম প্রবিষ্ট হল সেথায়,
সম্মুখে মোর স্বপ্রকাশিত অখণ্ড জ্যোতি তথায় ॥
বিরাট হয়ে বৃহৎ অহম্ বিন্দু একম্ আমি
স্নিগ্ধ জ্যোতির অনন্তরূপ তিনিই "ব্রহ্ম" নামী ॥ —শ্রীশ্রীমা

(উপরিউক্ত প্রবন্ধটি আমার সাধনরত অবস্থার স্বপ্নবৃত্তান্ত)

মায়া ও যোগমায়া

এক বিশাল দিশাহীন ক্ষীরোদ সমুদ্র। সেই সুবিশাল ক্ষীরোদ সাগরের মধ্যে দৃশ্যমান জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দৃশ্যও পরিদৃশ্যমান ছিল; ঠিক যেন মহাসমুদ্র মধ্যে এক অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক অপূর্ব জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সেই অদ্ভুত মহাসাগরের বক্ষে বহু অপরূপ কিশোর-কিশোরীগণ আপন আপন ভাবে খেলা করিতেছেন। বহুক্ষণ নিজভাবে নিজ স্বভাবে তাহাদের খেলা চলিবার পর হঠাৎ ক্রীড়াঙ্গনে আবির্ভূতা হইলেন এক অপরূপ সুন্দরী মৎসকন্যা। সেই অপরূপ মৎস কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্রীড়ারত কিশোর কিশোরীগণ মুগ্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাহারা এমনই মোহিত হইয়া পড়িলেন যে পলকহীন দৃষ্টিতে শুধু মৎস কন্যাকেই দেখিতে লাগিলেন। সকলেই যেন মৎস কন্যার সৌন্দর্য্যের মোহিনীরূপের মাধুর্য্যে জড়বৎ অচল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সুন্দরী মৎসকন্যার ঐ কিশোর কিশোরীদের সহিত ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা জাগিল। তিনি সবাইকে আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু দেখা গেল যে সকলেই জড়বৎ স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তখন মৎসকন্যা বিহ্বল হইয়া বলিলেন—"কি গো তোমরা? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন গো? আমি যে তোমাদের সঙ্গে খেলা করতে চাই।"

কিন্তু সকলেই স্তব্ধ, অনড়। এই অবস্থা অবলোকন করিয়া মৎসকন্যা সাগর বক্ষে দুঃখে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। যেমনি মৎসকন্যার অন্তর্ধান হইল, তখনি আবার কিশোর কিশোরীর দল সচল হইয়া আপন আপনভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্ষণিক বাদে আবার মৎসকন্যার আবির্ভাব হইল। মৎসকন্যাকে দেখা মাত্রই কিশোর-কিশোরীদের দল মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এইবার মৎসকন্যা তাঁহার নিজমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি

কিশোর-কিশোরীগণের সান্নিধ্যে গিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনমুগ্ধকর বিনয়ে সকলেই তখন মোহিত হইয়া জড় অবস্থায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। এমন বহুক্ষণ চলিতে লাগিল। ঠিক যেন মায়ারূপী সৎ-মা হইয়া মৎসকন্যা সকলকে যেমন ভাবে খেলাইতেছেন, তাহারা সকলেই তেমনি ভাবে খেলিতেছেন। আর কোনও দিকেই যেন কিশোর-কিশোরীগণের ভ্রূক্ষেপও নাই। এমন সময় অকস্মাৎ ক্ষীরোদ সাগরের কোনও এক প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া অপূর্ব মহাজ্যোতির্ময়ী রূপ লাবণ্যমণ্ডিতা পূর্ণতেজা কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রাভাসম্পন্ন দীপ্তিযুক্তা এক অতুলনীয়া দেবীসদৃশ নারীমূর্তির আবির্ভাব হইল।

সেই অতুলনীয় দেবীর আবির্ভাবের ফলে সমগ্র দিগ্‌দিগন্ত যেন গম্ভীর নিনাদে কম্পিত হইতে লাগিল। এই দেবীকে দেখিয়া মৎসকন্যা ও অন্যেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেবীর প্রতি মুগ্ধনেত্রে অনিমেষ নয়নে নির্বাক বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীদেবী মৎসকন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি তোমার মোহিনীরূপ এখুনি সংবরণ কর। এই যে এঁরা, সবাই আমার সন্তান। তুমি তোমার মোহিনী শক্তিরপ্রভাবে এদেরকে জড়পিণ্ডবৎ করে ফেলেছ। তাই এরা তাদের আপন স্বরূপ ভুলে তোমার সঙ্গে মোহমুগ্ধ হয়ে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে পড়েছে। আর ওদের সঙ্গে তোমার খেলা চলবে না। তুমি এই মুহূর্তে এদের পরিত্যাগ করে তোমার নিজ স্থানে গমন কর"।

দেবীর কথা শুনিয়া মৎসকন্যা বলিলেন—"ওরা আমার সঙ্গে খেলা করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে খেলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমি কেমন করে এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করি? এইবার রূঢ়স্বরে শ্রীশ্রীদেবী বলিলেন—"আমি আবার বলছি, হে মৎসকন্যা! তুমি এদের সান্নিধ্য সংস্পর্শ পরিত্যাগ কর। এঁরা আমার সন্তান। এরা সকলেই আমা হতে সমুদ্ভূত হয়েছে। তুমি কি জানো না যে আমিই এদের "মাতা"।

দেবীর বচন শুনিয়াও মৎসকন্যা সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শ্রীশ্রীদেবী আপন স্বরূপ ধারণ করতঃ ক্রুদ্ধ নেত্রে মৎসকন্যার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। দেবীর রোষে কটাক্ষ হইতে এক অদ্ভুত তেজময় দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল; সেই প্রবল মহাশক্তিসম্পন্ন তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসকন্যা তৎক্ষণাৎ ক্ষীরোদার্ণবে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মৎসকন্যাার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সকল কিশোর-কিশোরীগণ মহাশক্তি স্বরূপিনী চিন্ময়ী মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া জ্ঞানচৈতন্য লাভ করিলেন এবং নির্বাক বিস্ময়ে অসীম শক্তিধারিণী সেই দেবী মাতার উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। মহাশক্তিময়ী জননীও সন্তানের প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণকরতঃ স্মিতহাস্যে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সন্তানদের বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

সারাংশ ঃ—মহাশূন্যকে যখন ঈক্ষণ বা দর্শন করা যায় তখনই জগৎপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। ক্ষীরোদসাগরই হইল ভবার্ণব এবং মৎসকন্যা হইল "মায়া" স্বরূপা। এই মায়ার প্রভাবেই জীবাত্মা কালচক্র মধ্যে দৃশ্যমান জগৎকে অবলোকন করিয়া মোহমুগ্ধ হইয়া রহেন। ভবার্ণবে মায়ার গণ্ডীই হইল কালের কবলিত জীবাত্মার জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিবার ক্রীড়াঙ্গন। কিন্তু একদিন আসে, যখন মানবরূপী জীবাত্মা নিজমধ্যে আদি অনাদির সহজাত স্পন্দনকে অনুভব করিতে সক্ষম হয়। তখনই মানব হৃদয়ে আত্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে। সেই আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইবার ফলে অস্থায়ী মায়াপ্রপঞ্চরূপ সত্যের পরিত্যাগ হইয়া মানব হৃদয়ে আদ্যাশক্তি মহামায়ার যোগমায়ারূপ তত্ত্বের জ্ঞানময় শক্তির স্ফূরণ হয়। তখন ঐ যোগমায়ার রূপ দর্শন করিতে করিতে মানবের মনের মোহরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। এরপর মাতৃস্বরূপিনী বিশ্বজননী বিশ্বপ্রসবিত্রী আদিভূতা সনাতনী মাতা অবশেষে সন্তানকে তাঁহার অসীম ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

(উপরিউক্ত গল্প আমার সাধনরত অবস্থার স্বপ্নবৃত্তান্ত)

মাতৃতত্ত্ব

"কে জানে গো কালী কেমন?
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদাযোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে পটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জানে কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥"

একদা মাতৃসাধক শ্রীশ্রীরামপ্রসাদের প্রিয়ভক্ত ভজহরি প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই প্রসাদ! মায়ের রূপ কিরূপ আমাকে বুঝাইয়া দাও, এমন বিরাট মূর্তি ধারণ করিবার হেতু কি এবং ইহার প্রকৃত ভাবই বা কি, আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া না দিলে আর উপায় কি? আমি তোমার চির আশ্রিত—আমার প্রতি দয়া করিতে হইবে।" রামপ্রসাদ—"অতি ভণিতার আবশ্যক কি ভাই? যাহা তোমার আবশ্যক হইবে, জোর করিয়া বলিবে, তাহাতে কুণ্ঠাবোধ করিও না। মহাকালীর সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য, তবে সাধ্যানুসারে কিছু বলিতেছি—শ্রবণ কর। মা আমার কালো কেন জান? কালো বর্ণে সমস্ত বর্ণ লয় হয়, মা হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং কালে ইহা মায়ের শরীরেই লয় পাইবে। এইজন্য মা আমার কালরূপা কালী। ঈশ্বরকে যদি নিরাকার পরব্রহ্ম এবং

অবাঙ্মানসগোচর বলা যায় তাহা হইলে সাধারণ মানব নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী হইয়া যাইবে, সে জন্য তিনি এক হইয়াও বহু, পুরুষ হইয়াও প্রকৃতি, মা আমার সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শক্তি, সেই অদ্বিতীয় পুরুষ ধ্যান ধারণার অতীত, কাজেই তাঁহার শক্তিই আমাদের ধারণার বস্তু। মায়াযোগে তিনিই কালীরূপা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহার এই চারটি হস্ত, মা আমার ব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি; তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী; কালে সমস্ত বস্তুই কালকামিনী কালীর কাল দণ্ডে লয় পাইবে, এইজন্য মা আমার কালো একথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ গ্রাস করেন বলিয়া কালী, করাল বদনা, পাপীর পক্ষে ভয়ংকরা আর পুণ্যাত্মার পক্ষে অভয়দায়িনী, এইজন্য দক্ষিণহস্তদ্বয় ভক্তের জন্য আর বাম হস্তদ্বয় অসি-মুণ্ড ধরা— পাপীর জন্য, মায়ের কেশ-জাল জগতের মায়া জাল, মায়া যেমন চির বিস্তৃত ও দোলায়মান, কেশজালও তদ্রূপ। মা আমার দিগম্বরী, ইহা তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্বের পরিচয় দিতেছে। মা আমার চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই ত্রিনয়ন দ্বারা জগৎ অবলোকন করিতেছেন—এইজন্য তিনি ত্রিনয়নী। কালীর বীজমন্ত্র অভীষ্ট ফলদায়ক এবং তাহার জপে কালে ভয় নাশ হয়।”

“মন তোমার কি ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তা জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাও তাঁয় দিয়ে ছাড় ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যেমা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াবি তায় আতপচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না!”

রামপ্রসাদ এইরূপে ভজহরির নিকট মায়ের জপ এবং রূপ সম্বন্ধে বিবৃত করিয়াছিলেন।

ভজহরি—"আচ্ছা ভাই প্রসাদ। সিদ্ধিলাভ জিনিসটা কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।

রামপ্রসাদ—"একি বুঝবার জিনিস, না হলে বুঝান যায় না।"

ভজহরি—"একটু আভাসও তো পেতে পারি?"

রামপ্রসাদ—"আভাস আর কি?—যেমন খিচুড়ী তৈয়ার করতে হ'লে— হাঁড়িতে জল দিয়া চাল, ডাল, ঘৃত, মশলা সব ফেলে দিতে হয়— তারপর সেগুলো যখন সমস্ত মিশে এক হয়ে যায়, পরস্পরের অস্তিত্ব হারায়—তখন খিচুড়ী ঠিক প্রস্তুত হয়েছে বলে জানতে হবে। সেই রকম দেহ হাঁড়িতে ভক্তিরূপ জলে জীবের জীবত্ব, অহংতত্ত্ব কামনা, বাসনা, বৈরাগ্য অনলে সিদ্ধ করিয়া নিজস্বতা হারাইতে পারিলেই সিদ্ধ হওয়া হইল। প্রেমময়ীর প্রেম-সিন্ধুতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। মানুষ এই রূপ সিদ্ধিলাভের জন্যই সাধন ক্ষেত্রে এরূপ মর্ত্যে আসিয়াছে— এখানে আসার উদ্দেশ্যেই তাহাদের মা-ময় ভাবে সিদ্ধিলাভ করা। মনুষ্য জন্মে যে এরূপ সিদ্ধপুরুষ হইতে না পারে— তার আসা যাওয়াই সার।"

"কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।

যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো।"— যে ছেলে মাকে জানিতে না পারে, মায়ের আদর ভালবাসা না পায়, তার জন্ম বৃথা, নয়ত কি?— "মন রে কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন হইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥

কালী নামে দাও রে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।

সে যে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥"—

ভজহরি—"বৃথা, বলে বৃথা— তাহাকে তো মানুষ বলাই যায় না— আমরা কি আবার মানুষ?"

এই কথা শুনিয়া প্রসাদের কি ভাব হইল, তিনি এক দৃষ্টিতে আকাশের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। আকাশ তখন পরিষ্কার হইয়াছে। প্রাতঃকালে

গ্রামের ছোট ছোট বালকেরা রৌদ্র উঠিয়াছে দেখিয়া ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক ঘুড়ি শূন্যমার্গে উড়িতেছে। প্রসাদ ভাবের ঘোরে বিভোর হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন আর গাহিতেছেন—

"শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি ভবসংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বারাবারি ৷৷
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশ হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুইটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ী ৷৷
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি,
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে গিয়া তাড়াতাড়ি।"

সাধক কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদ ঘুড়ি ওড়ান দেখিয়া ভজহরির সহিত পূর্বপ্রসঙ্গের মীমাংসা করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই সঙ্গীতটিতে এক অপূর্ব পরমার্থ তত্ত্বের স্ফূরণ করিয়াছেন।

প্রসাদ বিশ্বজননী মাকে ভিন্ন জগতে অপর কোনও কর্তার অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেন না—তাই তিনি ঘুড়ির প্রতি চাহিয়া ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—"ভাই ভজহরি! আমার মা ভবরানী ঐ দেখ ভবসংসার বাজারের মাঝে ঘুড়ি উড়াইতেছেন—ঘুড়ি পাকশাট খাইয়া উড়িতেছে। সংসার মায়া সূতায় আবদ্ধ মন-ঘুড়ি আশা-বায়ুতে উড়িতেছে। তাহাতে কাক্‌গণ্ডী মণ্ডিত দেহ এবং পঞ্জরাদি নাড়ি গাঁথা। ঘুড়ি আপন কর্মফলেই নির্মিত—তাই কারিগরিরও সীমা পরিসীমা নাই। বিষয়রূপ মশলায় মাঞ্জা দিয়া মায়া-দড়ি খুব শক্ত হইয়াছে—তাই লক্ষ্যের মধ্যে দুই একটা কাটে অর্থাৎ মায়ের হাত এড়াতে পারে, মায়ামুক্ত কটা লোক হ'তে পারে? মা আমার নিজে এইরূপ ক'রে হাসেন অর্থাৎ বাহবা দেন। দক্ষিণা বাতাস বহিলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই মন-ঘুড়ি যদি মায়াপাশমুক্ত হতে পারে—

তাহলে অনায়াসে ভবপারে গিয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের চরণতলে আশ্রয় লইতে পারিবে।"

"কালী-পদ-মরকত আলানে মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এটে।
ওরে কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত ; মাথায় কর বেসার বেটে
ওরে এক পঞ্চভূতের ভার আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে
পাবে ঘরে ব'সে চারি ফল, বুঝনা রে দুঃখ চেটে।"

মনুষ্যজন্মে মাতৃনামে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেই মানব জন্ম বৃথা হয়। কিন্তু সেরূপ করা কি সহজ সাধ্য? সিদ্ধিলাভ এক জন্মের সাধনায় হয়না। কত জন্ম জন্ম ধরে ভোগ ক'রে ত্যাগী হয়ে তবে মায়ার হাত, বাসনার প্রলোভন এড়াতে পারা যায়। সেই ব্যক্তিত্ব সংসারে দুই-একজনকেই দেখা যায়। তবে মাতৃনামে যে মায়ামুক্ত হতে পারে, সে সহজতা সরলতায় মায়ের নাম জীবনে মন্ত্ররূপে অবলম্বন করতে পারে তারই ত্রাণ হয়।—

"মন রে তোর চরণ ধরি,
কালী ব'লে ডাক্‌রে ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরী।"

'মন তোমার এত ভাবনা কেনে, "কালী" জপ রে হৃদি পদ্মাসনে।' কালীর মুক্তযোগী স্বনামধন্য সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক সাধনার প্রভাবে নিজের প্রগাঢ় ভক্তি বলে ভক্ত বৎসলা ভগবতীকে মাতৃরূপে বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। সিদ্ধযোগীগণ পরমহংস অবস্থাতে স্বয়ং শিশুভাব রূপ বাৎসল্যভাবে ধারণ করিয়া অখণ্ড মহাশক্তিকে মাতৃরূপে অঙ্গীকার

করিয়াছেন। এই অনন্ত বৈচিত্রময় বিশ্ব যাহাকে আমরা নানা প্রকারে অনুভব করি, বস্তুতঃ শক্তির আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় কারণ জগৎ, লিঙ্গাত্মক উপলব্ধিত সূক্ষ্ম জগৎ ও ইন্দ্রিয়াদিগম্য স্থূল জগৎ শক্তিরই বিকাশ মাত্র। এই বিশ্বের মূলে যে পূর্ণসত্তা পারমার্থিক রূপে বর্তমান আছেন, তাহাই শক্তির পরমরূপ বলিয়া জ্ঞাত।

"জননী! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী ॥"
"কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে;
কালী ভক্ত, 'জীবন্মুক্ত যে ভাবে যে আছে।
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীন বন্ধু
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প গাছে ॥"

—হরি ওঁ তৎ সৎ

(সাধক রামপ্রসাদের রচনা ও জীবনী হইতে কিছু অংশ সংকলিত)

কবীর দর্শন

"শুভান্ তেরী কুদ্‌রত মেঁ কুরবান!
জলকে উপর বিছা বিছাবন্, তম্বুবনা আসমান ॥
চাঁদ সূর্য্য দো বনে মশাল ছিঁ—
তাবিচ নাচে জহাঁন ॥
জো ইয়ে নাচ দেখনে কো আয়া, বচ্চা ন বুঢ়া জোওয়ান
কহেঁ কবীর শুনো ভাই সাধো, 'এক নাম পহচান' ॥"

হে ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতির উপর তোমার কি অপরিসীম কৃপাকরুণা! বিস্তৃত জলরাশির উপর বিছানো রয়েছে সুবিস্তৃত আকাশরূপী আচ্ছাদন; এখানে চন্দ্র এবং সূর্য্য দুইই হল আলোকদানের মশালস্বরূপ; বিশ্বপ্রকৃতির মাধুর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যকে চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোকই প্রকাশিত করেছে। তারই মধ্যে এই পৃথিবী নৃত্যরতা। সৃষ্টির এই নৃত্যনাট্য যারা দেখছেন তারা হলেন শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক বয়স্কা সবাই। মহাত্মা কবীর সুধীগণকে বলছেন যে এত বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মূলে একজনই রয়েছেন। সেই 'এক' নামকেই সত্য জেনো।

পরম বৈষ্ণব রামানন্দ এসেছেন গঙ্গাতীরে। এক একটি সিঁড়ি ভেঙে ঘাট দিয়ে গঙ্গায় অবতরণ করলেন। মুখে তাঁর রাম নাম। নামমন্ত্র জপ করতে করতে অবগাহন করলেন পুণ্যসলিলা গঙ্গার কোলে। সর্বপাপনাশিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সুশীতল জলে অবগাহন করে স্নিগ্ধ মনে উঠে আসছেন রামানন্দ গঙ্গার কোল হতে। সিক্ত বসনে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে উঠছেন। ওপরের দিকে শেষ সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অনুভূতি বলে বুঝতে পারলেন, কী যেন ঠেকলো তাঁর পায়ে, তিনি তাকিয়ে

দেখলেন, কাপড় মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। একটু দূরে সরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে এখানে শুয়ে?"— তখন চারদিকে ধূসর আলো নেমেছে। আবছায়া অন্ধকারে জীর্ণবসন পরিধৃত একজন মুসলমানকে দেখতে পেলেন রামানন্দ। দেখামাত্র তিনি চিনে ফেললেন তাকে। ভাবলেন, "এতো সেই লোক!! এতো আমার কাছে পূর্বে এসেছিল দীক্ষা নেবার জন্যে!" এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল আরও অনেক স্মৃতি কবীরদাসের মুখপানে তাকাতে তাকাতে বৈষ্ণব রামানন্দের। তিনি ভাবলেন, একদিন তিনিই কবীর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তাঁরই জনৈক ব্রাহ্মণশিষ্যের কন্যাকে লক্ষ্য করে। এই মানুষটি আর কেউ নয়, ইনিই সেই কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ যুগসন্ধিক্ষণে এসেছেন হিন্দু-মুসলমান সমাজের হিতের জন্যে। কবীরের প্রতি তাকিয়ে বললেন রামানন্দ, "আমি তোমার কথা ভালভাবেই জানি। তুমি দিবারাত্র রামনাম জপ করো। তাহলেই বুঝতে পারবে তোমার স্বরূপ এবং কর্ম। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে অনেকরকম গোঁড়ামি রয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্মের শত্রু। প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ হচ্ছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে সমানভাবে ভালবাসা। ধর্মের দৃষ্টিতে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সকলেই সমান। বদ্ধ সংসারাসক্ত জীব মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্মের নামে ব্যভিচার করে। হে বৎস! তুমি উপযুক্ত সময়ে আমার কাছে দীক্ষিত হলে। তোমার সাধন-শক্তি জীব কল্যাণে নিয়োগ করবে। তোমাকে গৃহত্যাগী সাধু হতে হবে না। গৃহে থেকে তুমি রাম-মহিমা প্রচার করো।"

"জো এক নীড় হ্যায় গঙ্গাজী, এক নাম হ্যায় রাম।
জো এক চাঁদ ঔর এক সূরজ নীরবল কে বল রাম
—এক নাম হ্যায় রাম ॥

ত্যাজি মন কাম ঔর ধন ধাম অরজ করত যত নাম

কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো এক হী দশরথ
নন্দন রাম—এক নাম হ্যায় রাম।"

এতদিনে কবীরের আশা পূর্ণ হলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এল ঈশ্বরের করুণা গুরুর মাধ্যমে। তিনি ধূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালেন তাঁর শ্রীগুরুদেবকে। তাঁর অন্তরাত্মা কম্পিত করে গুঞ্জরিত হলো মধুর কণ্ঠস্বর—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

তারপর আপনা হতেই জপ করতে লাগলেন রামনাম। বিস্ময়াবিষ্ট কবীর ভাবতেই পারে নি কীভাবে তাঁর কণ্ঠ হতে এমন সুন্দর নাম এবং মন্ত্র উচ্চারিত হলো। যতই ভাবেন ততই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এ সদ্‌গুরু কৃপা ছাড়া আর কী।

"নাম অমল উতরৈ ন ভাঈ
ঔর অমল ছিন ছিন চঢ়ি উতরৈ
নাম অমল দিন বঢ়ৈ সওয়াঈ।
দেখত চঢ়ৈ সুনত হিয় লাগৈ
সুরত কিয়ে তন দেত ঘুমাঈ ॥
পিৰত পেয়ালা ভয়ে মতৰালা
পায়ো নাম মিটী দুচিতাঈ।
জো জন নাম অমল রস চাখা
তর গঈ গণিকা সদন কসাঈ
কহে কবীর, গুঁগে গুড় খায়া
বিন রসনা কা করৈ বড়াঈ ॥

ভাইরে, নামের নেশা কখনো যায় না টুটে। সব নেশারই রয়েছে হ্রাস আর বৃদ্ধি, কিন্তু নাম নেশা কেবলই যায় বেড়ে। নামের দিকে তাকালে নেশা বেড়ে ওঠে, শ্রবণ করলে হিয়াতে লাগে আর স্পর্শ নামে প্রেম

জন্মালে তনু হয় আবেশাচ্ছন্ন। নামের পেয়ালায় যে চুমুক দেয় সে হয়ে যায় মাতাল। নাম যে পেয়েছে সব দ্বিধা তার কেটে গেছে। নামরসের পাত্র যে চেখেছে, গণিকা হোক আর সদন কসাই হোক না কেন, সে ত'রে গেছে। মহাত্মা কবীর তাই বলছেন, বোবা খেয়েছে গুড়, তাই রসনায় নামের মহিমা সে বলবে কি করে?"

সদ্‌গুরু রামানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল কবীরের জীবনে। চৈতন্যময় নামের নেশায় কবীরের অন্তরে কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি হতে লাগল। সংসারে তিনি ছিলেন পদ্মপত্রের ওপর জলকণার মতো। সব কাজকর্ম করতেন কিন্তু কোনও কিছুতেই লিপ্ত হতেন না। কোন কর্মেই ছিল না তার আসক্তি। কবীর যে হরিভক্ত। হরির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাঁর আর ভয় কিসের? হরিই দেখবেন তাঁর সংসার। তাই তিনি অন্যদের বলতেন—

'দীন দয়াল ভরোসে তেরে
সভ পরবারু চড়াইয়া বেড়ে ॥"

অর্থাৎ, "হে দীনদয়াল! তোমার ওপরই আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।"

ঈশ্বর এক—তিনি পুরুষ। ভক্ত হচ্ছে প্রকৃতি বা শক্তি। সে প্রকৃতি ভাবে ঈশ্বরকে সেবা ও পূজা করবে। পরিণামে তাঁহাতেই লীন হবে। পত্নী যেমন পতিকে ভালবাসে, তেমনি স্ত্রীরূপে ভক্ত পতিরূপ ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁহাতেই তার মন-প্রাণ দেহ সর্বস্ব সমর্পণ করে আত্মহারা হয়ে যায় এবং বিমল আনন্দ উপলব্ধি করে। প্রেম ও ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

"চরখা চলৈ সুরত বিরহিন্‌কা
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর
মহল বনা চেতন কা।

সুরত ভাৰ্বী হোত গগনমেঁ, পীড়া জ্ঞান রতন কা
মিহিঁন সূত বিরহিন্ কাতৈ, মাঁঝা প্রেম ভক্তি কা ॥
কহঁে কবীর সুনো ভাই সাধো মালা গুঁথো দিন রৈণকা
পিয়া মোর ঐ হৈঁ পগা রখি হৈঁ, আসু ভঁট দেহোঁ নৈনকা ॥

সুরতি বিরহিনীর চরখা চলছে। কায়া নগরী রচিত হয়েছে অতি সুন্দর। তাতে রয়েছে চেতনার মহল। গগনে অর্থাৎ সহস্রারে সুরতি রূপী বধূ (কবীর-চেতনাস্বয়ং) ও বরের (ঈশ্বরের) চলছে অগ্নিপ্রদক্ষিণ আর তাদের জন্যে রাখা হয়েছে জ্ঞান রতনের পিঁড়ি। বিরহিনী কেটে চলেছে মিহি সুতো; পরনে তার প্রেমভক্তির প্রকাশরূপ হলুদ রঙা বিয়ের শাড়ী। অনুভবী সাধক কবীরজী বলছেন, ভাই সাধু শোন, ঐ সুতো দিয়ে দিন আর রাতের মালাগাছা তৈরী করে ফেলো। প্রিয় আমার করবেন পদার্পণ অশ্রুজলে দেব তাঁকে আমার প্রেমের ভেট। তারপর—

"ভীঁজে চুনরিয়া প্রেমরস বুদন
আরত সাজকে চলী হৈ' সুহাগিন
প্রিয় অপনে কো ঢুড়ন ॥
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনরিয়া?
কাহাকে লগে চারো ফুদন?
পাঁচ তত্ত্বকী বনী হৈ চুনরিয়া, নামকে লগে ফুদন ॥
চড়িগে মহল খুল গঈরে কিৰরিয়া
দাস কবীর লাগে ঝুলন।"

"প্রেম রসের ফোঁটায় ভিজে গেছে চুনরিয়া। আরতির সাজে সজ্জিত হয়ে প্রিয়তমের সন্ধানে প্রেমিকা চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো, তোমার চুনরিয়া কি দিয়ে তৈরী? চতুর্দিকের রোশনাই ঝালরই বা কিসের?— পঞ্চতত্ত্বের তৈরী এ চুনরিয়া, তাতে লাগানো হয়েছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয় মহলে এবার ওঠ গিয়ে, দুয়ার যে তোর গিয়েছে খুলে—দাস কবীর

তাই দেখেই দুলছে আনন্দে।" বিষয়ে অনাসক্ত হৃদয়েই হয় শুদ্ধাভক্তির জাগরণ। সেই শুদ্ধাভক্তিতেই সাধকরূপী ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। দাস কবীরজী বলছেন,

"জীব মহল মেঁ সিব পহুনৰাঁ, কহাঁ করত উন্মাদ রে।
পহুঁছা দেবা করিলৈ সেবা, রৈন চলী আৰত রে।
জুগন জুগন কৰে পতীছন, সাহব কা দিল লাগ রে।
সুঝত নাহিঁ পরম সুখ সাগর, বিনা প্রেম বৈরাগ রে।
সরবন সুর বুঝি সাহেব সে, পূরণ প্রগট ভাগ রে।
কহৈ কবীর সুনো ভাগ হমারা, পায়া অচল সোহাগ রে।"

অর্থাৎ "জীবের মহলে শিব (পরমাত্মা) অতিথি; ওরে উন্মাদ কী করছিস তুই! যে দেবতাকে পাওয়া গেছে, তাঁরই সেবা করে নে। রাত যে চলে আসছে অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের দীন-সূর্য্য ঢলার সময় ঘনিয়ে আসছে। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। প্রেম ও বৈরাগ্য ছাড়া পরম সুখসাগরের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে শব্দ কানে শুনেছিলাম (নাম) তা প্রভুর কাছ থেকেই এসেছে জেনে রেখো। এতে তোমার পরিপূর্ণ সৌভাগ্যই প্রকাশ পেয়েছে। দাস কবীর বলছেন, শোনো তোমার আমার ভাগ্যের কথা। আমি অবিচলিত স্বামী সোহাগ পেয়েছি। প্রেমই হচ্ছে সাধনার মূলমন্ত্র। বিশেষ করে ভক্তের পক্ষে প্রেমই হচ্ছে সাধন পথের আলো— একান্ত সহায়। ভক্ত কবীর প্রেমবলে তাঁর ইষ্টদেব "রাম" কে লাভ করেছিলেন। ভক্ত কবীরের ইষ্টদেব "রাম" হলেন তাঁরই আত্মাস্বরূপ। রামই হলেন কবীরের ঈশ্বর। কবীর বলতেন ঈশ্বরই গুরু। তিনি রাম বা রহিম, আল্লা বা ঈশ্বর যেই হোন না কেন, তিনি কবীরের গুরু। ঈশ্বরই গুরুর মধ্যে দিয়ে শিষ্যের বা ভক্তের কাছে আসেন। কবীর বলছেন,

"জো খোদায় মসজীদ বস্তু হৈ ঔর মুল্লুক কে হি কেরা,
তীরথ মূরত রামনিবাসী বাহর করে কো হেরা ॥

পূরব দিসা হরিকৌ বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজ দিলহি মেঁ খোজ-ই হৈঁ করীমা রামা।
জেতে ঔরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুমহারা
কবীর পোঁগড়া অলহ—রামকা সো, গুরু পীর মোরা।"

অর্থাৎ, যদি খোদা মসজিদে থাকেন, তবে বাকী জগৎটা কার? তীর্থ-মূর্তি সব রামের মধ্যেই রয়েছে (অর্থাৎ, নিজ অন্তরাত্মার অস্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে), বাইরে কে খুঁজে মরে? পূর্বদিকে হরির বাস আর পশ্চিমে নাকি আল্লার মোকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবলমাত্র অন্তরে খোঁজ। এখানে আছেন করিম্। এখানেই আছেন রাম। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর, আল্লারামের ছেলে। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।"

ঈশ্বর রয়েছেন সর্বত্র। এই বিশ্বচরাচরই হচ্ছে তাঁর মন্দির। আবার ব্যক্তির হৃদয়ও তাঁর মন্দির। সেইটিই হচ্ছে আসল মন্দির। সেখানে ঈশ্বরের স্থিতি উপলব্ধি হলে তখন আত্মদর্শন হয় এবং তার ফলে বিশ্বকে মনে হয় অতি আপনার জন। আত্মপর জ্ঞান তখন বিলুপ্ত হয়ে যায়। গুরু কৃপায় এবং নিষ্কাম সাধন ভজনের জন্যে মানুষের আত্মদর্শন ঘটে এবং তার ফলে ইষ্টদেবকে লাভ হয়। গুরু হলেন পূর্ণ জ্যোতি স্বরূপ, আত্মজ্যোতিস্বরূপ। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুইই। তাই কবীর বলেছেন,

"বেদ কহে সরগুণ কে আগে নিরগণ কা বিস্‌রাম।
সরগুণ-নিরগুণ তজহুঁ, দেখ সবহি নিজধাম।
সুখ-দুখ বহাঁ, কছু নহিঁ ব্যাপৈ,
দরসন আঠো জাম।
নূরৈ ওঢ়ন নূরৈ ডাসন, নূরৈকা সিরহান।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, সত্‌গুরু নূর তমাম্ ॥"

"বেদ বলে সগুণের সমাপ্তি ঘটে নির্গুণে, ওগো সৌভাগ্যবতী, সগুণ-নির্গুণ ত্যাগ করো। নিজধামের মধ্যে সব কিছু দেখো। ওখানে সুখ দুঃখের

অনুভূতি কিছু হয় না। অষ্টপ্রহর দর্শন মেলে। সেই ধামে জ্যোতিরই ওড়না, জ্যোতিরই বিছানা আর জ্যোতিরই বালিশ রয়েছে। কবীর বলছে, সাধু ভাই রে, শোনো, সদ্‌গুরু হলেন পূর্ণ (অখণ্ড) জ্যোতিস্বরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শকঃ এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টাবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য আহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥"

অর্থাৎ— (হে অর্জুন) "তুমি আমার যে রূপ দর্শন করেছ, সেইরূপকে বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। হে অর্জুন, অনন্য ভক্তি দ্বারা আমি এইভাবে অনুভূত হতে পারি। হে পরন্তপ! এভাবে আমি জ্ঞাত হতে পারি আর এভাবে তার দ্বারা প্রবিষ্ট হতে পারি। আবার কেবল ভক্তি লাভ করলেই হবে না। তাকে চিরস্থায়ী করার জন্যে প্রয়োজন হয় সদ্‌গুরুর কৃপা।"

ভক্ত কবীর বলেছেন,

("জাকে) বারহমাস বসন্ত হোয়, (তাকে) পরমারথ বুঝেঁ বিরলা কোয়।
বরিসৈ অগিনি অখণ্ড ধার, হরিয়র ভৌ-বন (অ) ঠারহ ভার।
পনিয়া আদর ধরী ন লোয়, পবন গহৈ কস মলিন ধোয় ॥
বিনু তরিবর ফুলে আকাশ, সিব-বিরঞ্চি তহঁ লেহি বাস।
সনকাদিক ভুলে ভঁবর বোয়, লখ চৌরাসী জোইনি জোয়।
জো তোহি সতগুরু সত্ত লখাব, তাতে ন ছুটে চরণ ভাব।
অমরলোক ফল লাবৈ চার, কহঁহি কবীর বুঝে সো পাব।"

অর্থাৎ "যথায় বারমাসই বসন্তকাল, সেই পরমার্থ পদ বুঝতে সক্ষম এমন মানব বিরল। অনন্তধারে অগ্নিতেজ বর্ষিত হচ্ছে তবু বন সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে আছে। লোকে যদি জলের (ভক্তির) যত্ন না করে তাহলে বাতাসেই

(প্রাণায়াম) ময়লা দূর হয়ে যাবে। সেখানে গাছ নেই, তবু আকাশ ফুলে ভরে থাকে। শিব আর ব্রহ্মা সেই ফুলের গন্ধ উপভোগ করেন। সনকাদি মুনি ভ্রমর হয়ে ভুলে রয়েছেন আর চুরাশী লক্ষ যোনিকে দেখছেন। সদ্‌গুরু তোমাকে যে সত্য দেখাবেন তাতেই ভগবদ্‌চরণে তোমার ভক্তি অবিচল থাকবে। এমনি যে করতে সক্ষম সে অমরলোকে চতুর্বর্গ ফললাভ করে। কবীর বলছেন, যে বোঝে সেই পরমপদ পায়।

মহাত্মা কবীরের বহু দোঁহা আছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি এখানে সংকলিত হয়েছে মাত্র। দোঁহাগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বোঝা যাবে যে মহাত্মা কবীর কত উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল। তিনি একাধারে যোগী, বৈদান্তিক, প্রেমিক এবং ভক্ত। তাঁর সাধনশক্তি অতুলনীয়। ভারতীয় সাধকদের মধ্যে ইনিই একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করে অমর হয়ে আছেন।

রবির আলোয় দিব্য

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস উপলক্ষে
তাঁর ব্রহ্ম উপাসনা সম্বন্ধিত রচনা)

"জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
রূপ সত্তায় এলে যবে সাজি সূর্য্য তারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবস রাত্রি।
সম্মুখে গেছে অসীমের পানে জীব যাত্রার পন্থ,
সেথা চল তুমি-বলো, কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।"

আমাদের পরম পূজনীয় বিশ্বকবি-গুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সঙ্গীত রচয়িতা, সুকণ্ঠ গায়ক এবং অন্যদিকে কাব্যের মধ্য দিয়া, সাহিত্যের মধ্য দিয়া, তাঁহার রচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও রসের সাধনা। বিশ্বময় মহাপ্রকৃতিকে নানা দিক হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে একদা কবি মন মহাপ্রকৃতির স্রষ্টার দিব্য অনুশাসন ও দিব্যের লীলা—মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য ও রসকে নিজ অস্তিত্বের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—'আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা বর্ষণেই হয় তার প্রকাশ। ঠিক তেমনই গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হইতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বভাববশতঃ প্রকৃতি ভেদ হয়; সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীত-কাব্যে দুইরকমের

অভিব্যক্তি হয়। এক হইতেছে সঙ্গীতাকারে বিশুদ্ধভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের আকারে মিশ্রিত হইয়া হয় ভাবের স্ফূরণ।' ভাব নিমগ্ন কবির ভাষায়— "যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে, সে হল বীর্যবান; কিন্তু শক্তির প্রকৃত সত্যরূপ হইল সৌন্দর্য্য। গাছের পূর্ণ শক্তি প্রকাশিত হয় তার ফুলে; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর রহে ভাবীকলের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরত্ব। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতা ফলিয়ে তোলে—অপিস-আদালতে কল-কারখানায় নয়।" উপনিষদ্ বলেছেন, "জন্মেছে বলেই সকলে অমর হয় না, যাঁরা অসীমকে উপলব্ধি করেছে তাঁরাই 'অমৃতাস্তে ভবন্তি' অর্থাৎ অমৃত হয়েন।"

"অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হেথায় পৃথিবী মনে মনে তার অমরার ছবি আঁকে ॥"

অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। সেইভাবেই ভাবিত বিশ্বকবি গাহিলেন—

"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥"

যে সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্য্যের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দরবার করিতেছেন, তিনি যে গুণীজাতিকে শিরোপা দিয়া বলেন—'সাবাস! আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলেছে'—সেই ধন্য, সেই অমৃতত্ব লাভ করে; তাঁর অমৃত সভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হইয়া যায়।

"হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে"—সেই পূর্ণত্বের চরণ লভিবার জন্যে চলিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ব্রহ্ম উপাসনা ও সাধনা। প্রাথমিক পর্য্যায়ে সাহিত্যিক কবি প্রকৃতির রস ও সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে নিজস্ব আরাধনাকে গভীর ভাবময় রূপ দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী

জীবনে রবীন্দ্রনাথকে মানবের অন্তরস্থিত প্রাণশক্তি, স্বভাবের পূর্ণতার সাধনার অতিন্দ্রীয় উপলব্ধি ও অনুভূতি সকল আকর্ষণ করিয়াছিল; ব্রহ্ম চেতনাপূর্ণ অসীমের অনুসন্ধানের প্রতি স্রষ্টা কবির হৃদয়কে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্ম উপাসনায় মগ্ন কবি তাই রচনা করিলেন—"নয়ন যারে খুঁজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা, ওরে যায় না কি জানা?"—এখানে রবীন্দ্রনাথ মানস নয়ন অর্থাৎ তৃতীয় নয়ন স্বরূপ মানবের অতিন্দ্রীয় জগৎকে অনুভব করিবার জন্যে যে চক্ষু ঈশ্বর দিয়াছেন, তাহার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মানস নয়ন দ্বারা অন্তর জগৎকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দার্শনিক কবি রচনা করিলেন—"আলোক পথে যাওয়া আসা, শুনি চরণ ধ্বনির ভাষা"—অর্থাৎ সেই সুমহান স্রষ্টার চরণের ধ্বনি কবি হৃদয়ের কন্দরে শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিশ্বস্রষ্টার চরণধ্বনি শুনিয়া কবির লেখনী হইতে নির্গত হইল এক অমূল্য গীত—

"মধুর ধ্বনির বাজে হৃদয় কমল বন মাঝে ॥"

তারপর—"শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে"—

কবি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল আদি অনাদির অনাহত ধ্বনির তান। ইহার পর অন্তরলোক অবলোকন কালে অন্তরস্থিত মানস গগনমণ্ডলে একদিন উদিত হইল এক অচিন্ নক্ষত্রসম জ্যোতিবিন্দু; ইহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ কবির লেখনীতে আসিল—

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে॥"

খুঁজিতে খুঁজিতে একদা পথের সন্ধান পাওয়া গেল।

"তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা,
ঐ যে সুদূর নীহারিকা!—"

অন্তরস্থিত অন্তরাকাশে অখণ্ড রাত্রির আকাশে নক্ষত্রসম জ্যোতির্বিন্দু ধীরে ধীরে প্রকটিত হইয়া উঠিল। সাধক কবির প্রাণে আলোক পথের নিশানা

মিলিল। সেই নীহারিকা সম বিন্দু তারকা সদৃশ জ্যোতির পথ অন্তরে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিল। যোগযুক্ত ব্রহ্ম উপাসনায় লিপ্ত কবি রচিলেন

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি ॥"

—ইহা কবি কল্পনার অত্যুক্তি নহে। ইহা সত্যের প্রকাশে কবি—মনের অব্যক্ত ব্যাকুলতার প্রকাশ মাত্র। এ অবস্থায় ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রাণে কবি গাহিলেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁওয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে।"
"আমার এই দেহ খানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো

যেখানে পড়বে সেথা দেখবে আলো ॥"—ধীরে ধীরে অন্তরাকাশ বিশুদ্ধ জ্যোতির্ময় আলোকে ভরিয়া উঠিল। সেই অগ্নিসমা জ্যোতির ধারায় স্নাত হইয়া কবি মন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।"

—আত্মজ্যোতির আলোকে আপ্লুত হইয়া কবির হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। কবির অন্তরে—"আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।" অখণ্ড জ্যোতির প্রকাশে উপাসনায় ধ্যানমগ্ন কবি-মনের সকল বাঁধন ছিন্ন হইয়া গেল;

মহাপ্রকাশের প্রকাশ ঘটিল তাঁহার জীবনে; নব জাগরণে দিব্যের পরশে তাঁহার দেহ মন প্রাণ অমৃতত্বে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।—"দিন রজনী কত অমৃতসর উথলি যায়ো অনন্ত গগনে"—"পান করে রবি-শশী অঞ্জলি ভরিয়া, সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি;"—"নিত্য পূর্ণ ধারা" পূর্ণ জীবনে। বিশ্বের অনন্ত রূপ দর্শন করিয়া কবি আনন্দ ধারায় প্লাবিত হইয়া চলিয়াছেন। সৃষ্টির বিশ্বরূপ দর্শনে তিনি পূর্ণতা প্রাপ্তির আস্বাদন করিলেন এবং প্রশান্ত হৃদয়ে দিব্য জ্যোতির আলোকে স্নাত হইলেন। দিব্যের সান্নিধ্যলাভ করিয়া কবি গাহিলেন—

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পূর্ণ হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।"
"আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদ্-গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর ॥"
"এই তোমারই পরশ রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত
এই তোমারই মিলন সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত ॥
তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করে লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর ॥"

দিব্যের স্পর্শে মনুষ্য জীবনের জন্মান্তর ঘটে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রহ্মদর্শনের, আত্মজজ্ঞানের উপলব্ধিত চরম সত্য রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"একথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। আত্মার আনন্দরূপ যা কিছু সে সৃষ্টি করেছে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে।" এই প্রসঙ্গে কাব্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত
বিরহ-মিলন কত হাসি অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয় ॥”

এখন কবি যেন এক ভরা ঘট। মহাজ্ঞানের উপলব্ধিত সত্যের আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইল সেই যুগযুগান্ত ব্যাপী চিরন্তন সত্যের অমরবাণী—

“স্বরূপ তার কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে ॥
তিনি নিজ অনুপম মহিমা মাঝে বিলীন—
সন্ধান তার কে করে, নিষ্ফল বেদ বেদান্ত।
পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহান—
তিনি আদি কারণ, তিনি বর্ণন-অতীত ॥”

বর্ণনাতীত অসীমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মানব জনম সার্থক। দিব্যের কৃপায় আলোকের পথে তাঁহার প্রভু দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এবার বিদায়ের পালা, তাঁর মুক্তির পথে—“এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়—দেহ মনের সুদূর পারে, হারিয়ে ফেলি আপনারে”—প্রশান্ত হৃদয়ে, শান্ত গম্ভীর ভাবে অমরত্ব লাভে বিশ্বকবি চির বিদায়ের বেলায় গাহিলেন—

“সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার ॥
মুক্তি দাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চির পাথেয় চির যাত্রায়।

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভর পরিচয় মহা-অজানার ॥”

উপসংহারে, মহাত্মা শ্রীমৎ অনির্বাণজীর কথায়—“একটা কথা জানতেই হবে, সৃষ্টির উৎস ঐ আদিত্য চেতনায়। ‘স্বর’ বলতে যাঁরা আলো আর সুর দুইই বুঝেছিলেন, সেই বৈদিক ঋষিরাই যথার্থ সাহিত্য স্রষ্টা। সাহিত্য মানেই আত্মার দীপ্তিতে মনের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা এই দিক দিয়ে বৈদিক ঋষির সাধনার সগোত্র। শুধু বাংলা সাহিত্যেই বা বলি কেন, জগতের সাহিত্যে বলতে গেলে তিনি একক।”

সনাতন ঐতিহ্য ও নজরুল

"খেলিছ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে, প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে"—এই বিশ্বজগৎ ও জগৎপতি উভয়ই অনন্ত। তাঁহার সৃষ্ট পদার্থও অনন্ত। সেই অসীম অনন্ত মহাশক্তিমানকে প্রকাশিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি নিজেই নিজেকে প্রকটিত করেন, তাই তাঁহাকে আমরা স্বপ্রকাশ বলি। সেই অনাদি অনন্তের স্বভাবকে মহাপ্রকৃতি বলা হয়। এই মহাপ্রকৃতিই হইলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া। এই মহামায়ার প্রভাবেই এই বিশ্বচরাচর নিখিল জগৎ সকল সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই বিরাট শিশুস্বরূপ জগৎপতির মহৎখেলা এবং জগৎ হইল তাঁহার খেলাঘর। সকল জীবের অগোচরে জগৎপতি তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা নিত্যভাবে সুসম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন। ঐ জগৎপতির স্বপ্রকাশরূপ স্বভাববশতঃ মহাইচ্ছার অভ্যুদয়েই হয় এই জগতের খেলা।

কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে। ধর্মান্ধতাকে দূর করিবার জন্যে যে কোনও ধর্মীয় সংস্কারকে তীব্র আঘাত করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। ধর্মবোধের সঙ্গে মানবিকতাপূর্ণ চিন্তার, আত্মবোধ সমন্বিত চিন্তার এবং বৈদিক-পৌরাণিক চিন্তাধারার সহিত তাঁহার যুক্তি তিনি মিলাইয়াছেন এবং ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাবের পরিচয় তিনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মোহম্মদ প্রভৃতি নবী অবতারগণকে একাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। "এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু, একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।" মহাত্মা কবীরের সহিত এ বিষয়ে নজরুল একমত। কবীর বলিয়াছেন— "সাঁই মেরা এক তু, ঔর ন দুজা কোঈ, জো সাহিব দুজা কহেঁ, দুজা কুল কো

হোঙ্গ ॥" "নিখিল বিশ্ব তোমাতেই আছে প্রভু তুমি মম শরণম্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"॥—শ্রীঅভয়।

"আমার সীমার বাঁধন টুটে, দশ দিকেতে পড়বে লুটে, পাতাল ফেঁড়ে নামবো আমি, উঠবো আমি আকাশ ফুঁড়ে, বিশ্বজগৎ দেখবো আমি হাতের মুঠোয় পুরে।"—সর্বনিয়ন্তা মহাকালের কালচক্র, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যভেদন ও সত্যদর্শন, আত্মদর্শন ও সর্বব্যাপী জীবনদর্শন—এই সকল বিষয়ের কারণে খোঁজ সাড়া জাগায় কিছু দার্শনিক মহাত্মনের মনে। আত্মবিদ্যালাভ ও সেই সাধনায় নিমগ্ন হইয়া সত্তার হয় চৈতন্যময় জাগরণ। তখনই সত্তামাঝে প্রবুদ্ধ হয় ধ্রুব তত্ত্বের স্ফূরণ। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাকালের কর্ত্রী মহাশক্তি স্বরূপিনী মহাকালী হইলেন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মা"। "সিন্ধুতে মা'র বিন্দুখানি ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক, বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা তাই দিক্‌ভুবন"।—অখণ্ড স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় অসীম গগণসদৃশ পরমব্যোম হইতে খণ্ডে খণ্ডে জ্যোতির্বিন্দুধারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হয়। ওই-ই সৃষ্টির আদি-অন্ত স্থান। সেই চিৎ অণুসম চৈতন্য বিন্দুগুলিই আনন্দময়ীর প্রকৃত স্বরূপ। উহা কালগণ্ডীতে পতিত হইয়া (চিৎ অণুসমবিন্দুদল) বৈচিত্র্যতা লাভ করে। আদিশক্তি মা মহামায়া মহাকালীরূপে কালকে করেন নিয়ন্ত্রণ—"চার হাতে মা'র চার যুগেরই খঞ্জনী, নৃত্য তালে নিত্য ওঠে রঞ্জনী।"

"কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যাঁর হাতে মরণ বাঁচন"—কালের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের বিবর্তন হইয়া চলিয়াছে। এই প্রচণ্ড কালগতিকে শান্ত করিতে পারেন একমাত্র মহাকালী। ইনিই হইলেন অখণ্ডকাল শক্তিরূপী "কাল মেয়ে"। ইনিই আবার প্রাণচৈতন্যের শান্ত স্থির অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। মহাকালী সেই পরাচৈতন্য বা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি। পরাচৈতন্য স্বরূপ শিব অবশ চৈতন্য হইয়া মহাকালীর পায়ের তলায় পড়িয়া আছেন। শিবই

প্রাণচৈতন্যের চঞ্চল প্রকৃতি অবস্থায় জীব চৈতন্যস্বরূপ নিম্ন প্রকৃতি সম্পন্ন জীব। আবার প্রাণ চৈতন্যের স্থির অবস্থায় জীব চৈতন্যই শিব চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েন অর্থাৎ জীবই আবার শিব হন। চৈতন্যের ভাবস্বরূপ ইচ্ছারূপী প্রকৃতি হইলেন "মা"। তাই, "স্থির হয়ে তুই বোস দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে, দেখবো নিত্য লীলাময়ী থির হলে তুই কেমন লাগে। দেখবো কেমন জননী তুই সাকারা না নিরাকারা, কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতিধারা।"—"তবু মায়ের রূপ কি হারায়, সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রতারায়, মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য্য প্রদীপ জ্বালি।"— আত্মতত্ত্বে করিলে রতি তাহাতে হয় শুদ্ধমতি, সেই হইল প্রকৃত "আরতি"। হৃদয় কমল ফুটিলে পরে আত্মসূর্যসম জ্যোতির প্রকাশ অন্তরাকাশ জুড়িয়া প্রতিভাত হইয়া পড়ে। আত্মসূর্য্যই আত্মজ্যোতি; উহা নিত্যজ্যোতি। তাই "নিত্য-সূর্য্য প্রদীপ জ্বালি" মায়ের আরতি করিতে হয়। এই আত্মজ্যোতির মধ্যেই হয় আদ্যামহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ। ইহা মহাজ্ঞান জ্যোতি। বিশুদ্ধ পরম জ্ঞানের আলোকে সাধক হৃদয় অখণ্ড জ্ঞানের ধারায় প্লাবিত হইতে থাকে; তখন তিনি মহাপ্রজ্ঞায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এ অবস্থায় মায়ের আবাহনও নাই-বিসর্জনও নাই। "এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন, নিত্যা হয়ে রইবি যবে হবে না তোর বিসর্জন।"

সমাধান

কোনও এক সাধুসন্তের সমাবেশে দুই দল সাধুর মধ্যে "ঈশ্বর দর্শন" ও "ঈশ্বর লাভ" সম্পর্কে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। কেমন করিয়া কি উপায়ে ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরলাভ করা সম্ভব হয় এ বিষয়ে দুই পক্ষের দুই প্রকার মতামত তাঁহারা প্রকাশ করিলেন। একদল সাধু বলিলেন—"তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করিয়া স্থান মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যের কারণেই শীঘ্র ঈশ্বরলাভ ও ঈশ্বরদর্শন সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়।" অন্যদল সাধুগণ বলিলেন—"না, কিছুতেই নয়। শাস্ত্র বলে, যাহা কিছু আছে এই দেহ ভাণ্ডে তাহা রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে; অর্থাৎ, তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া শুধু বৃথাই সময় নষ্ট হয়। দেহ মধ্যেই সর্ব্ব তীর্থ রহিয়াছে। সেই দেহের মধ্যে চক্রে চক্রে রমণ করতঃ যোগী সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এক আসনে বসিয়া, এক নির্দিষ্ট স্থানে আসনবদ্ধ করিয়া অন্তর্জগতের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে সাধন করিলে চিত্ত অন্তরমুখীন হইয়া দেহমধ্যে অবস্থানরত সর্ব্বতীর্থ সাধকের নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। তখন সন্ত সর্ব্বতীর্থের ফললাভ করেন। এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। তাই সাধনায় একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। ইত্যাদি।"

ঐরকম তর্কবিতর্ক সাধুদলের মধ্যে চলিতে লাগিল। যে যার নিজস্ব মতামত সম্মুখে রাখিয়া নানান বিষয়ে প্রমাণ সাপেক্ষ গল্প কাহিনী দিয়া নিজ নিজ দলের মতামতকে পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। বহু বাগ্‌বিতণ্ডাতেও তাঁহাদের আলোচনা প্রসঙ্গের সমাধান হইতে পারিল না।

এমন সময় কোথা হইতে এক অপূর্ব সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি সম্পন্ন মহাত্মনের সেথায় আবির্ভাব হইল। তিনি আসিয়া দুইপক্ষের সাধুসন্তের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"তর্কবিতর্ক বা আলোচনা দ্বারা কখনও ঈশ্বর প্রসঙ্গের

সমাধান হইবার নয়। আপনারা ভুল করিতেছেন। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন, আবার ভিতরেও আছেন। বাহির এবং ভিতর একাকার অবস্থায় দর্শন ও উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরীয় কোনও তত্ত্বকেই ভেদ করা কোনও মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীনানক সাহেব বলিয়াছেন—"বাহর অন্তর একহি জানো য়হ গুরুজ্ঞান বাতাঈ" অর্থাৎ সদ্‌গুরু হইতে জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও কিছুই হইবার নহে। সেই সদ্‌গুরু স্বরূপ পরমেশ্বরের কৃপালাভ না করিতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকার ঈশ্বর দর্শন ও উপলব্ধি কোনও কিছুই হইবার নহে। সুতরাং আপনারা মৌনতা অবলম্বন করিয়া যে যার গুরুপ্রদত্ত সাধনে ব্রতী হোন।"

সেই সভাস্থল যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একজন সাধু সেই দিব্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরু কৃপা" বলিতে কি বোঝায়? ইহা আমাদের স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব।"

মহাত্মা তখন বলিতে লাগিলেন—"সর্ব্ব প্রথমে শিবকল্প বাহ্যগুরুর কৃপা বা আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে হয়। যিনি অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া আত্মজ্যোতির দর্শন করাইয়া দীক্ষা দান করেন, তাঁহার কৃপালাভ করাই শিষ্যের প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, সদ্‌গুরু প্রদত্ত আত্মকর্ম করিতে করিতে যখন শিষ্যের কর্মবন্ধন নাশ হইয়া, সকল বৃত্তিপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া কর্মরহিত অবস্থায় অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমের দর্শন শিষ্য লাভ করেন, তখন শিষ্য গুরু কৃপাহি কেবলম্ অবস্থাকে নিত্য উপলব্ধি করিতে পারেন; তখনই গুরু কৃপাকে শিষ্য অনুভব করিতে শেখে। অর্থাৎ প্রকৃত গুরু কৃপার মর্ম তখনই শিষ্যের বোধগম্য হয়। তাহার পর অখণ্ড মণ্ডলাকার সদৃশ বিশ্বগুরুর অনন্তকৃপা লাভ করিতে করিতে গুরু-শিষ্য অভেদ হইয়া যান।"

এই কথা বলিয়াই সেই দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইলেন। তখন সকল সাধুসন্ত মিলিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

চাহিদা

পুরাকালে কল্যাণ দাস নামে একজন প্রকৃত ভক্ত ছিল। নিজ পরিবার-পরিজন লইয়া সে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। কিন্তু তাহার মনে কোনও সন্তুষ্টিবোধ ছিল না। তাই, নিত্য সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, "ভগবান আমাকে অনেক অর্থ-ঐশ্বর্য দাও, যাহাতে আমি স্বাধীনভাবে পরোপকার করিয়া মনের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব" ইত্যাদি। নিত্য প্রার্থনা করিতে করিতে একদা শ্রীভগবান তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিলেন। শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া সে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অভূতপূর্ব অর্থ ও সম্পত্তিরূপ ঐশ্বর্য লাভ করিল। তখন কল্যাণ দাস কিছুদিন নিজ পরিবারবর্গের সহিত তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিল। ইহাতে কল্যাণ দাসের তুষ্টি হইল না। সে ভাবিল, "শ্রীভগবান এই অপূর্ব পৃথিবীকে অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বিশ্বপ্রকৃতিকে এখনও সম্পূর্ণ দেখা হয় নাই। তাই তার মন শান্ত হয় নাই। কল্যাণ দাস বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইয়া রাজার হালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশ্ব পরিক্রমা করিবার পর কল্যাণ দাস একদিন নিজ কক্ষে বসিয়া ভাবিলেন, যে নাঃ, এতশত প্রচেষ্টার পরও তাহার মনে শান্তি আসে নাই। সেই পূর্বাপর অশান্তিতেই তিনি আছেন। তখন তিনি ঠিক করিলেন যে জনহিতার্থে দান করিবেন। পুরাকালে রাজাধিরাজেরা দানের মাধ্যমে সৎকর্ম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তাই কল্যাণ দাসও তাহাই করিবেন মনস্থ করিলেন। কল্যাণ দাস দান দিতে লাগিলেন। দরিদ্রকে ঘর করিয়া দেওয়া, দীনঃদুখী মানুষের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া, রোগশোকে সহায়তা দেওয়া, বস্ত্রদান, অর্থদান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দান করিতে করিতে

অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি মনে মনে অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তারপর কল্যাণ দাস ঠিক করিলেন যে ভোগ প্রসাদ বিতরণ করিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ কল্যাণ দাসের গৃহে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর মানুষকেই পেট ভরাইয়া খাওয়াইয়াও কল্যাণ দাসের মনে শান্তি আসিল না। তখন জীবজন্তু পশুপক্ষী সকলকেই তিনি খাওয়াইতে লাগিলেন। ইহাতেও তার মন পরিতৃপ্ত হইল না। এবার কল্যাণ দাস ঠিক করলেন যে সাধুসন্তের সেবা করিবেন। নানাভাবে সাধুসন্তের সেবা করিয়াও কিছু হইল না। তখন কল্যাণদাস ঠিক করিলেন যে ঈশ্বরদর্শী প্রকৃত কোনও সিদ্ধমহাত্মাকে সেবা করিয়া ভালমন্দ ভোজন করাইলেই বোধহয় তাহার আত্মা শান্তি লাভ করিবে। অতএব সিদ্ধ মহাত্মা কোথায় আছে? অনুসন্ধান করিতে করিতেই কল্যাণ দাসের কিছুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে তিনি তাহার কোনও বয়স্যের নিকট সংবাদ পাইলেন যে সিদ্ধমহাত্মা একজন আছেন, তিনি মহানগরীর বাহিরে কিছুদূরে জঙ্গলে বাস করেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই কল্যাণ দাস মহাত্মার নিকট পৌঁছিলেন।

একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে সৌম্যদর্শন এক সাধু বসিয়া আছেন। মহাত্মার মাথার উপর কোনও আচ্ছাদন নাই। উন্মুক্ত আকাশের নীচেই সাধুজীর আসন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কল্যাণ দাসের ভক্তিভাব উথলিয়া উঠিল। তাঁহার নিকটে যাইয়া কল্যাণ দাস সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সাধুজী কল্যাণ দাসের প্রণাম সমাপনান্তে কহিলেন—"কি উদ্দেশ্যে তোমার এখানে আগমন?"

কল্যাণ দাস বলিলেন—"বাবা, আমি আপনার ঘরটি নির্মাণ করিয়া দিব? এমন খোলা আকাশের নীচে আপনি গাছতলায় থাকেন!"

সাধুজী বলিলেন—"ঘরবাড়ি তো বহুকাল ছাড়িয়াছি, আর ওতে কি হবে? কোনও প্রয়োজন নাই।"

কল্যাণ দাস বলিলেন—"বাবা, আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছে, তাই আপনাকে আমার গুরুদেব বলিয়া বরণ করিলাম। যদি কৃপাপূর্বক আমায় একটি বার সুযোগ দেন তো আমি নিজ হস্তে পেট ভরাইয়া সুখাদ্য আপনাকে ভোজন করাইয়া নিজ আত্মশান্তি লাভ করিতে পারি।"

সাধুজী বলিলেন—"বৎস, তুমি বোধহয় জাননা যে আমি কাক্‌মুদ্রা করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আমার কোনও প্রকার ভোজনের প্রয়োজন হয় না। তবে এই বনের উত্তর দিশায় এক অতিবৃদ্ধা বুভুক্ষা রমণী বাস করেন। যদি তুমি তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইতে পারো তো আমিও পরিতৃপ্ত হইব।

অতএব কল্যাণ দাস গুরুদেবের আদেশে বনের পথে উত্তর দিশায় গমন করিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর একটি অতীব জরাজীর্ণ কুটীর দেখিতে পাইলেন। কুটীরের দাওয়ায় অতিবৃদ্ধা শীর্ণকায়া এক বুভুক্ষা রমণী বসিয়া আছে। কল্যাণ দাস বৃদ্ধার নিকট যাইয়া বলিলেন,—"মা, আমি আপনাকে ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করাইয়া প্রসন্ন করিতে চাহি।"

বৃদ্ধা কহিলেন—"আমি যতই খাইতে চাহি না কেন তুই আমাকে যোগান দিতে পারিবি তো? যদি যোগান দিতে না পারিস তো শেষে তোকেই খাইয়া ফেলিব।"

বৃদ্ধার কথা শুনিবামাত্রই তো কল্যাণ দাসের ভীতি আসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এও কি কখনও সম্ভব? স্বয়ং গুরুদেব যখন পাঠাইয়াছেন তখন আর ভয় কি? সুতরাং কল্যাণ দাস বৃদ্ধা রমণীর খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিলেন। বৃদ্ধা রমণী প্রচুর খাদ্য সম্মুখে পাইয়া খাইতে লাগিল; ক্রমশঃ খাইয়াই চলিয়াছেন, তাঁর পেট আর যেন ভরে না। দিন যায়, রাত যায়; এমনি করিয়া মাস-বৎসর চলিয়া গেল। কল্যাণ দাস এদিক ওদিক সকল নগরী, মহানগরী, গ্রাম, গঞ্জ ইত্যাদি সব স্থান হইতেই খাদ্য যোগাড়

করিয়া দিতে লাগিলেন। এমনি হইতে হইতে চতুর্দিকে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আর খাদ্য সামগ্রী কোথাও রহিল না। তখন বৃদ্ধা কল্যাণ দাসকে "এইবারে তুই আয় তোকেই খাই" বলিয়া যেই ধরিতে গেল, ভয়ে কল্যাণ দাস গুরুনাম স্মরণ করিতে করিতে এক ছুটে সাধুজীর চরণে গিয়া পড়িলেন—"বাবা, আমায় কার কাছে পাঠিয়েছেন যে তিনি আমাকেই খাইবার জন্যে আজ উদ্যত হইয়াছেন; বাবা আপনি আমার সদ্‌গুরু, আমায় রাক্ষসী রমণীর হাত হইতে রক্ষা করুন।" তখন স্মিত হাস্যে সাধুজী বলিলেন, "বৎস, যে রমণীর নিকট তোকে পাঠিয়েছি, তিনিই হলেন, তোরই অন্তঃস্থিত "চাহিদা"র স্বরূপ। তোর চাহিদা বা মানুষের পার্থিব চাহিদা একমাত্র মৃত্যুসময়েই নির্বাপিত হইবে। তখনই তুই শান্ত হবি এবং শান্তি পাইবি। যাহার চাহিদা থাকে সে কখনই পরিতৃপ্ত হইয়া অন্তরে শান্তিলাভ করিতে পারে না।"

লোভীর পরিণাম

দিগম্বরনাথজী ছিলেন একজন মহাযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। একদিন তাঁহার নিকট মঙ্গলদাস নামে একটি লোক আসিল। মঙ্গলদাসকে দেখিয়া দিগম্বরনাথজী বলিলেন—"তুমি কেন আমার কাছে আসিয়াছ?"

মঙ্গলদাস বলিল—"বাবা, আমি আপনার দাস আছি; আপনার সান্নিধ্যলাভ করিয়া আপনার সেবাকর্ম করিতে চাই।"

দিগম্বরনাথজী বলিলেন—"আচ্ছা, এখন থেকে তুমি এখানেই থাকো।"

সেদিন হতেই মঙ্গলদাস যোগীরাজের সান্নিধ্যে থাকিতে লাগিল। তারপর প্রায় সাত-আট বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এতদিন মঙ্গলদাসের গুরুসেবার কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় নি। অক্লান্ত পরিশ্রমে সমর্থ মঙ্গলদাসের সেবায় তাহার গুরুবাবা খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু দিগম্বরনাথজী মহাসিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তাই একদা রাত্রে মঙ্গলদাসকে নিজকক্ষে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মঙ্গলদাস, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট; কিন্তু আমার সেবাকার্য্যে তুমি যে এতদিন অতিবাহিত করেছ, তা কেন করেছ? তা তো তুমি আমায় কখনো বলো নি। তোমার মনের প্রসুপ্ত বাসনার কথা বিদিত হয়েই আমি আজ তোমায় কিছু আশীর্ব্বাদ দান করব। তুমি তোমার মনের সুপ্ত বাসনার কথা আমায় খুলে বলো।"

মঙ্গলদাস বলিল—"বাবা, আমি আপনাকে সেবা করেছি শুধু একটি বিষয়ের কামনায় তা আপনিই একমাত্র আমায় প্রদান করতে পারেন। বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির মর্যাদায় সম্মানিত হই। আমার মতো শ্রেষ্ঠতম ধনী যেন পৃথিবীতে আর কেউ না থাকে। এছাড়া আর কিছুই আমার চাই না।"

মঙ্গলদাসের কথায় যোগীবর কিছুক্ষণ শান্ত রহিলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন— "বেশ তাই হোক। তোমাকে আমি যেমনটি বলব ঠিক তেমনটি যদি তুমি করতে পারো তবে তুমি এই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলেই চিহ্নিত হবে।" তারপর যোগীবর মঙ্গলদাসকে চারটি ধূপকাঠি দিয়া বলিলেন— "কালই যাত্রা কর। একটি করিয়া ধূপকাঠি জ্বালিবে, সেই ধূপকাঠি যতক্ষণ জ্বলিবে, কোনও নির্দিষ্ট দিক অনুসরণ পূর্বক ততদূর সিধা অগ্রসর হইতে থাকিবে। তারপর সেই ধূপবাতি নিভিয়া যাইবে, তখনই সে স্থানে তোমার কাম্য বিষয়বস্তু সকল সন্ধান করিও, তাহা পাইবে। এক, দুই, তিন, তিনটি ধূপের কাঠি প্রজ্বলিত করিয়া তিনবার তিন দিশায় চলিও। যথায় ধূপের বাতি নির্বাপিত হইবে তথায়ই তোমার কাম্য বস্তু মিলিবে। কিন্তু সাবধান!!! চতুর্থ ধূপকাঠিটি আর জ্বালিবে না, তবে ঘোর ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা।

পরের দিন গুরুর নির্দেশিত মতানুসারে প্রথম ধূপের কাঠি প্রজ্বলিত করিয়া মঙ্গলদাস একটি দিশা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। অনেক দূরে চলিতে চলিতে অবশেষে সন্ধ্যার পূর্বে গভীর ঘন জঙ্গলের মধ্যে ধূপের আগুন নিভিয়া গেল। মঙ্গলদাস তথায় অবস্থান পূর্বক খুঁজিতে লাগিলেন। জঙ্গলী গাছের গোড়ার মাটি সব খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ অনেক রূপার দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত মঙ্গলদাস পাইলেন। মঙ্গলদাসের তো আনন্দ আর ধরে না। অতি সন্তর্পণে সমগ্র রাত্রি ধরিয়া মঙ্গলদাস অক্লান্ত পরিশ্রমে গুপ্তধন আপন সুবিধা মতো লুকাইয়া রাখিলেন। কারণ পরের দিন আবার অন্য দিশায় চলিতে হইবে। সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। ভোর হইতে না হইতেই মঙ্গলদাস দ্বিতীয় ধূপের কাঠিটি জ্বালিলেন ও সিধা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সমগ্র দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে দিবাবসানে মঙ্গলদাস এক ভগ্ন শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেথায় আসিয়া ধূপকাঠি নিভিয়া গেল। রাতের

অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়া মঙ্গলদাস অস্থির চিত্তে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি প্রাচীন সুবৃহৎ লোহার বাক্স মিলিল। বহু কষ্টে বাক্স খুলিয়া মঙ্গলদাস দেখিলেন— ভিতরে প্রচুর সোনার জিনিস রহিয়াছে। অনেক অনেক সোনা!! আনন্দে আত্মহারা হইয়া মঙ্গলদাস গুরু বাবাকে প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। তারপর নিজের হিফাজতে সমগ্র সোনা সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া মঙ্গলদাস পরের দিনের যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রির অবসানে দিনের আলো ফুটিতে লাগিল। আর দেরী না করিয়া মঙ্গলদাস তৃতীয় ধূপকাঠিটি জ্বালিয়া অন্য আরেক দিশায় গমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র দিন চলিতে চলিতে মঙ্গলদাস ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তথাপি পূর্বের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির আনন্দ তাহাকে কত গ্রাম, কত শহর, জঙ্গল পার করাইয়া অবশেষে আরও গহন ঘন জঙ্গলে আসিয়া পড়িলেন তিনি। রাত্রির অন্ধকার আসিবার পূর্বেই এক নির্দিষ্ট স্থানে ধূপকাঠি শেষ হইয়া গেল। মঙ্গলদাস তথায় অবস্থান করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে মঙ্গলদাস বড় বড় বস্তায় বাঁধা সব কি যেন পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। মশালের আলোয় বস্তাগুলি কাটিয়া মঙ্গলদাস দেখিলেন— বাবা! কত রত্ন!! মণিমুক্তা হীরা পান্না চুনী ইত্যাদিতে পূর্ণ আরও কত কি? সমগ্র রাত্রি ধরিয়া মঙ্গলদাস হিসাব করিলেন— প্রথমে রূপা, তারপর সোনা, তারপর জহরত— সব তাহার নিজের! আহা! কি পরম তৃপ্তি! ঐ সমগ্র সম্পদ একজোট হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হওয়া যায় কি?? চতুর্থ ধূপকাঠি জ্বালিতে মানা আছে। কিন্তু কেন? চতুর্থ দিশায় না যাওয়া পর্যন্ত তো বলা যায় না সেথায় কি পাওয়া যাইবে? তিনে যখন এত, তখন চারে না জানি কত? যদিও গুরুদেব মানা করিয়াছেন, তাতে কি হইল? আমি তো ধনী হয়েই গেছি; আর তো গরীব হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব— কালই চতুর্থ যাত্রা করিব। নিশ্চয়ই আরও প্রাচুর্য্যের সন্ধান মিলিবে, যে সন্ধান

যোগীরাজ স্বয়ং জানেন এবং উহা তিনি নিজের করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলদাস মনস্থির করিয়া ফেলিলেন যে ভোর হইবামাত্র রওনা হইবেন।

পরদিন ভোর হইবামাত্র চতুর্থ কাঠিটি জ্বালিয়া মঙ্গলদাস চলিতে লাগিলেন। গুরু-আদেশ লঙ্ঘন করিলেন মঙ্গলদাস। তিনি জানিতেন না যে চতুর্থ ধূপকাঠিটি ছিল "মায়া কাঠি"—তাই ঐ কাঠি নিভিতেই চাহিল না—জ্বলিয়াই চলিয়াছে আর মঙ্গলদাসও দিনের পর দিন চলিতেছেন—অবশেষে মঙ্গলদাস এক বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে গহন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখনও কাঠি নেভে নাই। সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা নামিল; মঙ্গলদাস হঠাৎ এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেলেন আর হস্তের ধূপকাঠিটি জ্বলন্ত অবস্থায় ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। ধনলাভের লোভে মঙ্গলদাস মনে বল রাখিয়া আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে সম্মুখস্থ প্রস্তরখণ্ডটি সরাইতে লাগিলেন। বহু কষ্টে প্রস্তর খণ্ডটি সরানোর পর দেখা গেল একটি লৌহ কপাট বন্ধ রহিয়াছে। দরজাটি একটি সুবিস্তৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার দরজা বলিয়া মনে হইল। মঙ্গলদাস ভাবিল, পেয়েছি। এখানেই সেরা গুপ্তধন আছে, তাই গুরুদেব তাহাকে সন্ধান দেন নাই। ধীরে ধীরে লৌহ কপাট খুলিয়া যেমনি গুহার ভিতরে মঙ্গলদাস প্রবেশ করিলেন, তখনি গুহার ভিতর হইতে কে যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে গুহার বাহিরে যাইয়াই লৌহ কপাট সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। মঙ্গলদাস 'কে' 'কে' ? বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাহির হইতে সে লোকটি বলিল—"এখন তুই এখানে বন্ধ থাক্। তোর মতো, তোর চেয়েও অধিক লোভী আবার যদি কেউ আসে তবেই তুই মুক্তি পাবি। যেমন আজ আমি পেলাম।" তারপর বৃহৎ প্রস্তরটি সরাইয়া বাহিরের মানুষটি গুহা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণকুম্ভ

আজ হতে প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বের কথা। ব্রহ্মর্ষি মহাতপা মুনি অমৃত কুম্ভে প্রয়াগে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুই পরমহংস শিষ্যও আছেন। ব্রহ্মর্ষি মহাতপার বয়স কত হইতে পারে তাহা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুমান করা যায় না। তাঁহাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি বলেন— "ম্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখা হুঁ।" ব্রহ্মর্ষির নাতিদীর্ঘ কায়া, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, গায়ের রং চাঁপা ফুলের সদৃশ; তাঁহার পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র ও কম্বল। তাঁহার আলুলায়িত জটাভার ও তাঁহার দৃষ্টি সদাই ঊর্দ্ধদিশায় নিবদ্ধ রহে। ব্রহ্মর্ষির সঙ্গী দুইজনকে দেখিলেও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া আসিবে। পরমহংস দুইজন যেন সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ। প্রয়াগে যমুনা নদীর পারে তখনও কিছু কিছু জায়গা ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ব্রহ্মর্ষিত্রয় সেই জঙ্গলের সমীপবর্তী যমুনাতটে বাঁশের খুঁটি গাড়িয়া তাহার উপর ছাউনি বিছাইয়া আসন পাতিয়াছেন। মনে হয় যেন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে ওঁনারা ছাউনির সকল আসবাব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। নয়ত লোকালয়ের বহিরাগত তেমন স্থানে কেমন করিয়া ঐসব আসবাব পাইবেন, যেখানে অন্য তটে গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলিতে তীর্থযাত্রীর ভিড়ে টেঁকা দায়।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রি নামিল। প্রথম পরমহংসদেব ব্রহ্মর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বপ্পন, আপনি কুম্ভমেলায় কেন আসেন? আর আপনার ইহ জীবনে অর্থাৎ যখন হইতে কুম্ভমেলা আরম্ভ হইয়াছে, সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ কুম্ভমেলায় যোগদান করা কখনও আপনার বাদ যায় নাই। এর কারণই বা কি? আমায় বিস্তারিত ভাবে বলুন।"— স্মিতহাস্যে মহাতপা বলিতে লাগিলেন—"কুম্ভমেলার এক

বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে। প্রাচীন কালে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রয়াগে সাধুসন্তের মহাসঙ্গমে মহাসমারোহে এই মেলা হইত। ঐ সময় হইতেই প্রয়াগে কুম্ভমেলার পুনঃপ্রচলন হয়। ইহারও আদিকালে পৌরাণিক যুগে মহামুনি কপিলেশ্বরের সাগরসঙ্গমের আশ্রমে জ্ঞান কুম্ভের আয়োজন হইত। তথায় ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মবিদ্যার আদান প্রদান করিতেন। কুম্ভমেলা সাধুসন্তের মেলা বলিয়াই জগতে বিদিত। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হইতে সকল সম্প্রদায়ের সকল মতাবলম্বিগণের সম্মিলন হইত এই প্রয়াগ-ত্রিবেণী মহাসঙ্গমে। গৃহী ধনী-দরিদ্র সাধারণ ভক্ত মানুষেরাও সেখানে আসিতেন সাধু সেবার পুণ্যফল অর্জন করিতে আর প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী (অন্তঃসলিলা) এই তিন নদীত্রয়ের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া পুণ্যার্থীগণ সকল পুণ্য সঞ্চয় করেন। সেই প্রাচীন কাল হইতেই এই সকল ধর্মীয় প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এতো গেল বাহ্যিক বিষয়। আসলে অধ্যাত্ম জগতে কুম্ভমেলার একটি যে বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কুম্ভমেলার নাম "কুম্ভমেলা" হইল কেন?— "কুম্ভ" শব্দের রূপকার্থ হইল আমাদের এ দেহ ভাণ্ড। মহাত্মা কবীরসাহেব বলিয়াছেন—"জলমে কুম্ভ, কুম্ভমে জল হ্যায়। বাহর্ ভিতর পানি।। ফুটে কুম্ভ জল, জলহি সমানা, এ তথ কহো হ্যায় জ্ঞানী।। আদে গগনা অন্তে গগনা মধ্য গগনা ভারী।। কহত কবীর করম কিসি লাগে, ঝুটি এক উপায়।।"— জল অর্থাৎ চৈতন্যময় বা প্রাণময়; ব্রহ্মচৈতন্যময় সাগরে কুম্ভ স্বরূপ ভাসমান সত্তা বিরাজ করে, আবার দেহরূপ কুম্ভের মধ্যেও প্রাণের পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকে। বাহিরেও প্রাণময়ং জগৎ আবার ভিতরেও প্রাণময়ং জগৎ। সেই দেহরূপ কুম্ভে সাধনা করিতে করিতে যোগীর প্রাণময় চেতনা প্রসারিত হইয়া অসীম মহাপ্রাণময় চেতনায় যুক্ত হইয়া পড়ে। এই রকমই তত্ত্ব কথা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। সৃষ্টির আদিতেও গগন আছে, অন্তেও গগন আছে, শুধু মধ্যের গগনই ভারী, কারণ সেখানে প্রাণময়ং জগৎ প্রপঞ্চের প্রকাশ আছে। তাই

কবীর সাহেব বলিতেছেন যে যদি কাহারও কর্মযোগ লেগে যায় তবে প্রাণ মহাপ্রাণে বিলীন করিবার জন্যে ওই-ই একমাত্র উপায়। তবে মিথ্যার আশ্রয় নিলে কর্মে কালি লেগে যাবে।" যোগিগণ যোগসাধনা প্রভাবে আপন কুম্ভকে যোগৈশ্বর্য্যের সমন্বয়ে জ্ঞান মহাজ্ঞানে ভরপুর করিতে থাকেন। ঐ কুম্ভরূপী যোগীর আধার যখন পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া সর্ব্বব্যাপী পঞ্চমহাভূতকে জয় করিয়া ফেলেন ও ষষ্ঠ ভূমি আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিতে সক্ষম হন তখন যোগীর ষট্ চক্র ভেদ হইয়া যায় এবং তিনি হন পরমহংস। সেই কারণে সাধনার তাৎপর্য্যের মাহাত্ম্য অনুসারে ছয় বৎসরে হয় অর্দ্ধকুম্ভমেলা। যোগীর কুম্ভ পরিপূর্ণ হইয়া যায় যখন তিনি দ্বাদশ স্তর অতিক্রমণপূর্বক ব্রহ্ম চেতনায় লীন হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া যান। তাই ১২ বৎসরে হয় পূর্ণকুম্ভ যোগ অর্থাৎ পূর্ণকুম্ভমেলা। এই পূর্ণকুম্ভে বহু পুণ্যযোগী, মুনি, ঋষিকল্প মহাত্মাগণের জগতের হিতার্থে সম্মিলিত হইতে হয়। এই কারণেই পূর্ণকুম্ভের মাহাত্ম্য মহান।"

কুম্ভমেলার মাহাত্ম্য কথন শ্রবণ করিয়া দুই পরমহংস তাঁহাদের পরমগুরু মহাতপাকে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে নত মস্তকে প্রণাম জানাইলেন।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

প্রাচীনকাল হইতে প্রবাদ আছে যে মৌনী অমাবস্যা তিথিতে কাশীর গঙ্গায় স্নান করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। এই উপলক্ষে একবার কাশীতে লক্ষ লক্ষ, শরণার্থীর সমাগম হইয়াছিল।

মৌনী অমাবস্যা তিথি। কাশীর গঙ্গায় স্নান করিয়া ত্রিপাপ মুক্ত হইবার মানসে শরণার্থীর দল সূর্যোদয়ের পূর্বেই গঙ্গার তীরে আসিয়া পড়িয়াছেন আর দলে দলে গঙ্গায় স্নাত হইতেছেন এবং ত্রিলোকেশ্বর বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

ওদিকে শিবলোকে হরপার্বতী সানন্দে বসিয়া ধরাতলের কাশী মাহাত্ম্য অবলোকন করিতেছিলেন। অগণিত মানুষের সমাবেশ ও আচরণ দেখিয়া শ্রীমতী পার্বতী দেবী অকস্মাৎ ভীত হইলেন ও ভোলা মহেশ্বরকে বলিলেন—"হে নাথ, প্রবাদ আছে, শুনিয়াছি যে মৌনী অমাবস্যা তিথিতে কাশীতে ভোলানাথের মহিমা অপার। যে ব্যক্তি কাশীর গঙ্গাবক্ষে স্নাত হইবেন সেইই এই শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অগণিত মানুষ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি। ঐ অগণিত মানুষের গতি যদি এই শিবলোকে হয় তবে তো এখানে প্রবল স্থানাভাব হইবে। অতএব, এখন তো মহাসঙ্কটের অবস্থা!"

পার্বতীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া সদাশিব ভোলানাথ কোনও রূপ বিচলিত হইলেন না। শান্ত মূর্তিধারী ভোলানাথ তাঁহার অর্দ্ধনারীশ্বরীকে বলিলেন—"দেবি! তুমি চঞ্চলা হইও না। এ কথা সত্য ও শাশ্বত জানিও যে এই বিশিষ্ট তিথিতে পূর্ণ বিশ্বাসে উপনীত হইয়া যে জন কাশীর গঙ্গায় স্নাত হইবেন, তিনি ত্রিতাপ ও ত্রিপাপ মুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন।

চলো আমি ও তুমি ছদ্মবেশে কাশীতে উপনীত হই এবং দেখি কতজনের শিবলোক প্রাপ্তি হয়।"

তখন স্বয়ং শিব এক মৃত ষণ্ডের রূপ নিলেন ও পার্বতীদেবী এক কিশোর বালকের রূপ নিলেন। শিবরূপী মৃত ষণ্ড ও পার্বতীরূপী কিশোর বালক গঙ্গার তীরবর্তী কোনও রাস্তার ধারে এক জায়গায় স্থান লইলেন। গঙ্গায় স্নাত হইয়া শরণার্থীগণ যে রাস্তা ধরিয়া ফিরিয়া যাইবেন, সেই রাস্তাতেই এক পাশে একটি মৃত ষণ্ড ও এক কিশোর বালককে অঝোরে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল। বালক বলিতে লাগিল—"কে আছ ভাই পুণ্যার্থী, আমার এই একমাত্র সঙ্গী মৃত ষণ্ডটিকে একটু স্পর্শ করুন না, আপনাদের গঙ্গাস্নানের অতি পুণ্যবলে এই ষণ্ডটি পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে।"

সমগ্র দিবসব্যাপী বহু অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও কেহই বালকের কথায় ষণ্ডটিকে স্পর্শ করিল না। কেহ ভাবিল, যদি ষণ্ডকে স্পর্শ করার পর ষণ্ডটি জীবিত হইয়া না ওঠে তবে তো এইই প্রমাণ হইবে যে তাহার পুণ্যলাভ হয় নাই। অতএব, ষণ্ডকে স্পর্শ করিয়া ভক্তের দল পুণ্যলাভের পরীক্ষা দিতে নারাজ হইলেন। এইভাবে দিবসের অবসান হইল ও সন্ধ্যা-রাত্রির সময় আসন্ন হইল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরূপী ভক্তের দল চলিয়া গেল। গঙ্গার ঘাটও নির্জন হইয়া পড়িল। ত্রিসীমানায় কেহ নাই দেখিয়া বালক ষণ্ডের কাছে গিয়া বলিল—"হে নাথ, চলো এবার শিবলোকে ফিরে যাই।"

ষণ্ড বলিলেন—"এখনও তিথির সময় অল্পক্ষণ বাকী; আরও একটু বিলম্ব করিয়াই বরং যাওয়া যাইবে।"

একটু পরেই দেখা গেল একটি মদ্যপ ব্যক্তি টলিতে টলিতে আসিতেছে। সে গঙ্গার তীরে আসিয়াই প্রথমে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। তারপর নিজ মনেই বলিল—"ওঃ, সারাজীবনে যা কুকর্ম করেছি, হে মা গঙ্গা, আমায় ক্ষমা করো মা। এমন পুণ্যলাভের সুযোগ ছাড়া চলবে না।"

বলিয়াই ঝপাং করিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া কিছুক্ষণ স্নান করিল। তারপর "জয় বাবা বিশ্বনাথ তোমার করুণা অপার, তোমায় এ দীনের নমস্কার"— এই বলিতে বলিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া আসিতে ছিল, এমন সময় বালক তাহার সম্মুখে যাইয়া ষণ্ডকে স্পর্শ করিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। কিশোর বালকের কথায় স্নেহবশীভূত হইয়া মাতাল জিজ্ঞাসা করিল— "কোথায় বাবা তোমার মৃত ষণ্ড?" বালক ষণ্ডটির নিকটে মাতালকে লইয়া গেল। মাতাল হঠাৎ এক মুহূর্ত স্থির হইয়া কি যেন ভাবিল, (ভাবিল— নাঃ, যা পাপ করেছি তা গঙ্গাস্নানের পূর্বেই করেছি, গঙ্গায় ডুব দেবার পরে তো আর কোনও পাপ করিনি, অতএব আমার পাপ তো বাবার চরণে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে, তবে আর ষণ্ডটিকে স্পর্শ করতে আপত্তি কোথায়?) তার পরক্ষণেই ষণ্ডের নিকট গিয়া "জয় বাবা বিশ্বনাথ কৃপা কর" বলিয়া যেই ষণ্ডটিকে স্পর্শ করিল ওমনি ষণ্ড সাক্ষাৎ জীবন্ত শিবরূপে প্রকটিত হইল এবং বালক পার্বতীদেবীর রূপ ধারণ করিয়া মাতালকে লইয়া শিবলোকে চলিয়া গেলেন।—

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।"

সম্ভবামি যুগে যুগে

সেই মহান পুরুষ যখন অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাকে রূপায়িত করিয়া তিনি অবতীর্ণ হন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ।" অংশাবতার, যুগাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার রূপে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োজনানুরূপ লীলাবিস্তার করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দনন্দন শ্যামসুন্দর পূর্ণশক্তি লইয়া দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভগবান যখন নরলীলায় আসেন, তখন আপনার সুবিপুল মহিমা সংযত করিয়া নরলীলার অনুরূপ লীলা প্রকাশ করেন। ভগবানের প্রকাশ হয় বড়ই নিগূঢ়। এইজন্য সেই অমিতশক্তিধর মহান পুরুষ যিনি কটাক্ষে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় ঘটাইতে পারেন, তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি দ্বারা উপদ্রুত হওয়া বরণ করিয়া লন, অন্যদিকে বাৎসল্য প্রেমানুরোধে মাতার নিকট তাড়ন ও বন্ধন হাসিমুখে সহ্য করেন। নদীয়া লীলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করেন। পদ্মাবতীর কূলে কূলে নবীন অধ্যাপকরূপে বিদ্যাবিতরণ করেন, খোলবেচা শ্রীধরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া কলার খোল সংগ্রহ করেন। ভগবৎ লীলার এই ঐতিহ্য অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াও শেষ হইবার নহে। কিন্তু এই নরলীলার মধ্যেও পুঞ্জমেঘে সৌদামিনীর মত তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির ক্ষণিক প্রকাশ হয়, ভগবানের বিশিষ্ট ভক্তগণ প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত নয়নে সেই মহাশক্তির বিকাশ দর্শন করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহনের আবির্ভাবেও তেমনি তাৎপর্য রহিয়াছে। শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কোনও প্রিয় ভক্তকে

মহাজ্ঞান অর্পণ করিয়া প্রসাদিত করিবার জন্য এবং বিশিষ্ট ভক্তনিচয়কে অনুগৃহীত করিবার জন্য যমুনাকূলে গোবরডাঙায় সন ১২৭১ বাংলার ২৬শে পৌষ স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। জননী কাশীশ্বরী দেবী গৃহবিগ্রহ শ্রীশ্রী শ্রীধর জীউর কৃপায় পূর্বাহ্নেই জানিতে পারেন যে শ্রীশ্রীনারায়ণ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব লীলায় যাঁহারা শ্রীশ্রীভগবানের মাতৃসম্বন্ধীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সুপ্রচুর বিরহ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইজন্য কাশীশ্বরী দেবী এইবারও মাতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের বিশেষ আগ্রহ প্রযুক্ত ভগবানের ইচ্ছাপূরণ করিতে তিনি সম্মত হন।

যথাকালে শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহন রূপে আবির্ভূত হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। বালকের অলৌকিক প্রতিভার স্ফূরণ দেখিয়া জননী কাশীশ্বরী আরও আশ্বস্ত হন যে শ্রীশ্রীনারায়ণই তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দূর্ব্বাদলকান্তি এই বালক যাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারই মনোহরণ করিয়াছেন। ক্রমশঃ অতুলনীয় প্রতিভার দ্বারা তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তদানীন্তন জেনারেল এসেম্বলীজ্ ইন্‌স্টিটিউশনে বি. এ. পড়িবার সময় কলেজের অধ্যক্ষ Mr. Hesty-র সহিত বাইবেলে উদ্ধৃত বাণীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণের জন্য তাহার অনেক আলোচনা হইত। Mr. Hesty এই প্রতিভাবান ছাত্রের নিকট হইতে বাইবেলে লিখিত বাণীর মুখ্যার্থ ও প্রাচ্য দর্শনের বহু দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। তিনি কিছুকাল সংসারলীলার অভিনয় করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য কাশীবাসী হইলেন।

ইতিমধ্যে তিনি স্বয়ং তাঁহার গুরু নির্বাচন করিলেন। তাঁহার স্বনির্বাচিত গুরু ৺কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সেই সময়কার একজন প্রখ্যাত যোগী

ছিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের গুরুকরণের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য সাধনপথে গুরুকরণ একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুদেহ অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীভগবানের গুরুশক্তি শিষ্যের সাধনে পথ সুগম করিয়া দেন এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজেই নিজের গুরু নির্বাচন করেন। বিশেষতঃ এই অবতারে শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহন ব্রাহ্মণদেহে গুরুমূর্তি ধারণপূর্বক নানা লীলা প্রকটিত করায় অপ্রয়োজনেও তাঁহার গুরুকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গুরু ৺কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম দিনে শিষ্য সাধনমার্গের কোন স্তরে আছেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নিভৃতে শিষ্যকে লইয়া আসনে বসিলেন। মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন শিষ্যের ষট্‌চক্রভেদ হইয়া গিয়াছে এবং সহস্রদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত পথ খোলা। কোথাও কোনও বাধা নাই। নিমেষে প্রজ্ঞাবান গুরু বুঝিতে পারিলেন যে শিষ্য মুক্ত পুরুষ। তাঁহার সাধন করিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই। অথচ গুরু অবগত ছিলেন যে তাঁহার নিজেরই সাধন পরিপূর্ণ হইতে আরও কিছু বিলম্ব আছে। এতাধিক উপলব্ধি অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহন যে মুক্তপুরুষেরও উর্দ্ধে, গুরুদেবের সেই সময় তাহা সম্যক বোধ হয় নাই। শ্রীশ্রীভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে পরে তিনি জানিতে পারেন। শিষ্য গুরুর প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই ঘটনার পর গুরুও শিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ৺কেশব ভট্টাচার্য মহাশয় একসময় শিষ্যকে এই বলিয়া অনুনয় করেন যে সাধনবলে এই জন্মে তাঁহার মুক্তিলাভ সম্ভব হইল না। শিষ্য যেন তাঁহাকে অন্তিমকালে স্কন্ধে করিয়া উদ্ধার করেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীভগবান কিশোরীমোহন যখন কাশীবাসী হন সেই সময় তথাকার পণ্ডিত সমাজে তাঁহার বিপুল দার্শনিক জ্ঞানের খ্যাতি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। ভারত ধর্ম-মহামণ্ডলের Comparetive Philosophyর চেয়ার তাঁহাকে প্রদান করা হয় এবং কাশীর বাঙালী

সমাজের প্রধানগণ তাঁহাকে তথাকার Kashi Central Institution School এর প্রধান শিক্ষক পদে বৃত করেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পঞ্চদশী প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই সকল গ্রন্থ হইতে তিনি যে কোনও সময় যে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক সময় তাঁহার মনে হইত, পূর্বকালে এইসব তত্ত্ব তিনিই পরিবেশন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদের সকল প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করিয়া দিতেন। ইহাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (কাশী Queen's College এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) অগ্রগণ্য। ইনি শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের লীলা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের সম্যক তথ্যানুসন্ধান করিয়া "কলিতে ঐশ্বরিক লীলা" নামক একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীশ্রীভগবানের বিশেষ নির্দেশে এই গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশ করা হয় নাই।

কাশীতে প্রণবানন্দ স্বামী যোগীরাজ, "প্রণবাশ্রম" নামক এক আশ্রম স্থাপন করেন এবং তাঁহার অগণিত শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে সাধনায় অগ্রসর কতিপয় শিষ্যাকে তিনি দেহত্যাগের পূর্বে বলেন যে তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, তিনি সাধন সংক্রান্ত উপদেশ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু দিব্যজ্ঞানে তিনি অবগত আছেন যে কাশীতে একজন মুক্তপুরুষ আছেন, সেই মুক্তপুরুষ শিষ্যাদিগকে সাধনের বিশিষ্ট উপায় নির্দেশ করিয়া দিবেন। গুরুদেবের দেহান্তে শিষ্যাগণ কায়মনোবাক্যে মুক্ত পুরুষের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহাদের পরিচিত সকলকে তাঁহারা অনুরোধ করেন যেন কাশী মধ্যস্থ গুরুনির্দিষ্ট মুক্তপুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে উহারা সাহায্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুদক্ষ

পুলিশকর্মচারী, যিনি শ্রীশ্রীভগবানের মহিমা পূর্বেই অবগত হইয়া ছিলেন, তিনিই শ্রীশ্রীভগবানকে "প্রণবাশ্রমে" লইয়া আসেন। এই ঘটনাই শ্রীশ্রীভগবানের ঐশ্বরিক লীলার সূত্রপাত করে। শ্রীশ্রীভগবানের সহিত কথোপকথন করিয়া প্রণবাশ্রমের সাধিকাগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন এবং তাঁহার পুনরাগমনের জন্য তাঁহার বাসস্থান কোথায় জানিতে চাহেন। শ্রীশ্রীভগবান উত্তর করিলেন যে তাহাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য কোনও লোক পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে না। সাধিকাদের মধ্যে যে কেহ মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই অভিনব পন্থা কিরূপে ফলপ্রসূ হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রথম দিনেই সাধিকাদের মধ্যে প্রধানতমা তাঁহাকে মনে মনে দিবসের পূর্বাহ্ণে স্মরণ করিলেন। শ্রীশ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ দিব্য জ্যোতির্ময় শরীর লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই অসময়ে আপনারা কেন আমাকে আহ্বান করিলেন।" এইভাবে নানা সময়ে অসময়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সাধিকাগণ বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীশ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, স্মরণ করিবামাত্র তিনি যেন বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া উপস্থিত হন।

তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে প্রণবাশ্রমের সাধিকাগণ শুষ্ক শোলা। সাধিকারা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে শ্রীশ্রীভগবান তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা বেশ প্রস্তুত হইয়া আছেন যেন জ্ঞানের দীপ, সংস্পর্শমাত্র তাঁহারা দীপ্যমানা হইয়া উঠিবেন। পরন্তু শ্রীশ্রীভগবান অন্য তাৎপর্য লইয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সাধিকাগণ নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা করিয়া একান্তভাবে ভক্তিরস শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রধানা সাধিকা আশৈশব ব্রহ্মচারিণী মনোমোহিনী দেবীকে (যিনি উত্তরকালে "সন্ন্যাসিনী মা" বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন), শ্রীশ্রীভগবান বলিয়া ছিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তুর

সমাবেশ হইয়াছে। তিনি ঐ সকল বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাদের অন্তর নানা রত্নে পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। ঐ সময় "সন্ন্যাসিনী মা" খেচরী মুদ্রায় চিত্ত সমাহিত করিবার অভ্যাস করিতেন। শ্রীশ্রীভগবান রহস্য করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসিনী, তোমার খিচুড়ী আমি খাইয়া দিব।" ইহার পরের দিন হইতেই সন্ন্যাসিনী মা অনুভব করিলেন যে তিনি আর 'খেচরী মুদ্রায়' মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে তাঁহার প্রবল অতৃপ্তি দেখা দেয় এবং অসীম বিরক্তি লইয়া শ্রীশ্রীভগবানের বাড়ীতে তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহার খেচরী মুদ্রায় সাধনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার জন্য শ্রীশ্রীভগবানকেই দায়ী করেন। সন্ন্যাসিনী মা বলেন, "আমাদের গুরু মহারাজ বলিয়া গিয়াছেন যে একমাত্র শ্রীশ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহ আমাদের সাধন পথে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তোমা হইতে সেই বাধা আসিয়াছে। অতএব বল, তুমিই কি ভগবান?"

এই প্রথম ভগবান শ্রীকিশোরী মোহনকে 'ভগবান' বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন। ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহন অবশ্য তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া বলেন যে মানুষ কি কখনও ভগবান হয়! কিন্তু সন্ন্যাসিনী মায়ের বারংবার সনির্বন্ধ মিনতিতে কৃপা পরবশ হইয়া শ্রীশ্রীভগবান তাঁহার স্বকীয় ভগবত্তা অঙ্গীকার করেন এবং সন্ন্যাসিনী মাকে আশ্বস্ত করেন যে তাঁহাদের হঠ্যোগ সাধনার বিনিময়ে তিনি তাঁহাদিগকের চিত্তে ভক্তিরসের সরস বর্ষা নামাইয়া দিবেন এবং কোথাও কোনও বিশেষ দিনে শ্রীশ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিনী মায়ের পক্ষে "খেচরী মুদ্রায়" মনঃসংযোগ করা সম্ভব হইবে। এইরূপে শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের লীলার প্রবর্তন হইল।

সন্ন্যাসিনী মায়ের গুরুভগিনী বালুরঘাটের জমিদারকন্যা, সর্বমঙ্গলাদেবীর শ্রীশ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও অনুরাগ দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। সন্ন্যাসিনী মা, সর্বমঙ্গলাদেবী এবং তাহার অন্যান্য গুরুভগিনীগণ এবং তাঁহাদের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিগণ ভগবান বলিয়া শ্রীশ্রীকিশোরী

মোহনকে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ গড়িয়া উঠে। শ্রীশ্রীভগবানের বাক্যকে তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া প্রণিধান করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীভগবান একান্ত সদয় হইয়া তাঁহাদের নিকট নানাভাবে, নানারূপে, নানাস্থানে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করেন। এ বড়ই বিচিত্র লীলা! শ্রীশ্রীভগবান প্রায়শঃ নিজের গৃহে অবস্থান করিতেন। বিশেষতঃ রাত্রিতে কোথাও বাহিরে যাইতেন না। কিন্তু সাধিকারা তাঁহাদের সাধন গৃহে দিনে কিম্বা রাত্রিতে যখনই শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনকে স্মরণ করিতেন তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন। গৃহের বাতায়ন ও দ্বার অর্গলবদ্ধ এই অবস্থায় ধ্যানমগ্ন সাধিকারা দেখিতে পাইতেন তাঁহাদের পূজার আসনে তিনি সমাসীন। আবির্ভূত ভগবান সাধিকাদের সঙ্গে কথা বলিয়া, তাঁহাদিগকে সাধনার দুরূহ অংশ বুঝাইয়া দিতেন এবং তাহাদিগের সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া দিতেন। শ্রীশ্রীভগবানের এই আবির্ভাব স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়। এই সাক্ষাৎ আবির্ভাব দিবালোকের ন্যায় সত্য। আবির্ভূত শ্রীশ্রীভগবান কোনও ভক্ত সাধিকার অনুনয়ে চন্দনের বাটি হইতে চন্দন তুলিয়া লইয়া তাঁহার কপালে লেপন করিয়া দিয়াছেন। আবির্ভূত ভগবানের অঙ্গুলির দাগ চন্দন পাত্রের অবশিষ্ট চন্দনের মধ্যে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সাধিকার কপালও চন্দনে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সম্পূর্ণ অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠ হইতে ভগবান পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। আবির্ভূত ভগবানের নিকট অন্য কোনও ভক্তের নামে স্থূলদেহী ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনকে নিমন্ত্রণ করিলে নিমন্ত্রণের পরদিন সেই ভক্তের গৃহে স্থূলদেহী ভগবান উপস্থিত হইতেন এবং আবির্ভূত ভগবানের সঙ্গে যেসব বাক্যালাপ হইয়াছে তাহা অবিকল বলিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীভগবানকে কোনও প্রশ্ন করিতে হইলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করা সকল সময় প্রয়োজন হইত না। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোনও

প্রশ্ন করিলে আবির্ভূত ভগবান কোন সাধক বা সাধিকার নিকট তাহার উত্তর সম্যক সমাধান বলিয়া দিতেন। এই বিচিত্র লীলা অনেক সাধক ও সাধিকার নিকট একই সময়ে দূর বিস্তীর্ণ বহু দেশে এককালে প্রকটিত হইয়াছিল। স্থূলদেহী শ্রীশ্রীভগবান ও তাঁহার আবির্ভূত স্বরূপ— দুই স্বরূপই ভক্তদিগের সঙ্গে নানা লীলাবিলাস করিতেন। শ্রীহট্ট জেলার প্রখ্যাত আইনজীবী বিমলা চরণ শ্যাম মহাশয় শ্রীশ্রীভগবানের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া অনুগৃহীত হন। এইরূপে শ্রীহট্টে শ্রীশ্রীভগবানের এক ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। রাজশাহী, দিনাজপুর, কাশী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে একই সময়ে ভগবান নানা ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া লীলা প্রকাশ করেন। অথচ স্থূলদেহে শ্রীশ্রীভগবান তখন বারাণসীতে বিরাজ করিতে ছিলেন। এই লীলা এমনই প্রত্যক্ষ ছিল যে আবির্ভূত ভগবানের প্রকাশে কোনও সংশয় থাকিত না।

বালুরঘাটের জমিদার কন্যা সর্বমঙ্গলাদেবী (মা জননী) শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি এমনই বিশ্বাসবর্তী হইয়াছিলেন যে তাঁহার বাক্যে নির্ভর করিয়া জীবন সংশয়স্থলেও ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। একদিন তিন গুরুভগিনী কাশীতে গঙ্গার ধার দিয়া আসিবার সময় মা জননী সন্ন্যাসীমাকে বলিলেন—"সন্ন্যাসী, ভগবান তো এখন আমাদের সঙ্গে লীলা করছেন। দ্বাপরে তো জলবিহার করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে তো সেরকম কিছু এখনও হল না। এ কথা বলিতে না বলিতে গঙ্গাবক্ষ হইতে একটি মাঝি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল—"আপনারা নৌকোয় যাবেন?"

মা জননী বলিলেন—"পয়সা নাই"।

মাঝি বলিল—"পয়সা নেই তো টাকা দিবেন"।

সন্ন্যাসিনী মা তখন মা জননীকে বলিলেন—"ফেলুদিদি (তিনি তাহাকে ঐ নামে ডাকিতেন, তাহাতে মনে হয় মা জননীর ডাক নাম ছিল ফেলু), নৌকা বিহার হতে গেলে ষোলো আনা দিতে হয়, তাই মাঝি ষোলো আনা চাইছে"।

মা জননী মাঝিকে বলিলেন—"বেশ তো চলো। আশ্রমের কাছে ঘাটে নৌকো লাগিয়ে পরে আশ্রম থেকে তোমায় টাকা এনে দেবো।" ষোলো আনা না দিলে ভবপারের নৌকোয় ওঠা যায় না। (অর্থাৎ ভবসাগর পার হইতে গেলে ষোলো আনা মন দিয়া ভগবানকে ডাকিতে হইবে।)

এরপর তাঁহারা তিনজন নৌকোয় দশাশ্বমেধ ও ঘোড়া ঘাটের মাঝখানে গেলে মা জননী বলিলেন—"সন্ন্যাসী! জলের ভেতর হতে ভগবান বলছেন, 'ঐ দেখ আমি জলে পড়েছি, তুমি পড়তে পারো'?" সন্ন্যাসী মা বলিলেন—"ভগবান বলছেন বলুন, তুমি যেন জলে পোড়োনা।" মা জননী বলিলেন—"ভগবান আবার বলছেন যে!! 'কেমন প্রেম তোমার ভগবানের উপর, তিনি জলে পড়েছেন আর তুমি পড়তে পারলে না'।"

সন্ন্যাসী মা নিষেধ করিতে না করিতে মা জননী নৌকো হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং নৌকো একেবারে কাত্ হইয়া গেল। মা জননী কিন্তু মোটেই সাঁতার জানিতেন না এবং তাঁহার অতি স্থূলাকার দেহ ছিল। ইহাতে সন্ন্যাসী মায়েরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। স্রোতের টানে নৌকো দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী মা তখন মাঝিকে, যেখানে মা জননী জলে পড়িয়াছিলেন তথায় নৌকা লইয়া যাইতে বলিলেন। মাঝিও তাহাই করিল। প্রকৃত ভগবৎপ্রেম সঞ্জাত হইলে ভক্ত প্রাণের মায়াও ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সন্নিধানে ছুটিয়া যায়। মা জননী সেই দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইলেন। কিছু সময় পরে মা জননীর বিশালাকায়া দেহ চীৎ হওয়া অবস্থায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিল ও সন্ন্যাসী মা ইহা দেখিয়া "গুরু কৃপাহি কেবলম্" বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় মা জননী ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাই বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। মাঝি তখন নৌকা মা জননীর নিকট লইয়া গেল। মা জননী তখন সন্ন্যাসী মাকে বলিলেন—'সন্ন্যাসী, আমায় নৌকায় তোলো'। সন্ন্যাসী মা বলিলেন—"তোমাকে কি করে তুলব? তুমি ঢ্যাপা; তোমাকে যে ফেলেছে সেই তুলুক।"

তারপর মা জননী নৌকার কিনারা ধরিলেন ও নৌকোখানা তাহাদের ঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হইল। ঘাটে পৌঁছিলে পর ঘাটের মধ্যে তক্তবাঁধার যে বাঁশ ছিল তাহা ধরিয়া মা জননী টপ্ করিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলেন।

অতঃপর মা জননী জলে পড়িয়া তাঁহার কি অবস্থা হইল তাহা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"জলে যখন পড়লুম, তখন আমার বোধ হল যেন ভগবান আমাকে কোলে তুলে নিলেন, আর যখন জলে উঠে ভাসছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল যেন একখানা তক্তার উপর শুয়ে আছি। ঘাটের বাঁশ ধরে যখন উঠলাম তখন মনে হলো কে যেন দুহাত দিয়ে তুলে ধরে আমায় নৌকায় ফেলে দিলেন।"— ইহার পরে সর্বমঙ্গলাদেবী বলিলেন যে আবির্ভূত ভগবানের এক হস্তের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গার প্রবল স্রোতে তিনি নিমজ্জিত হন নাই।

যে মহাজ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বতঃ মুক্তি কখনও লাভ করা যায় না এবং সে মহাজ্ঞান কালে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই মহাজ্ঞান তাঁহার প্রিয় ভক্তকে অর্পণ করিবার জন্য অশেষ দয়াবান শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহন তাঁহার প্রিয় ভক্তের নিকট অতি জ্যোতির্ময় বিশাল বপু ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইতেন। শ্রীশ্রীভগবান তাঁহার ভক্তের অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতেন— ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম-দর্শনের দুই অঙ্গ আছে— একটি গৌণ বা সাধারণ, অপরটি মুখ্য বা বিশেষ। গৌণ বা সাধারণ ধর্ম হইল প্রধানতঃ নীতিমূলক এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশেষ ধর্ম বা মুখ্য ধর্ম হইল— মোক্ষ ধর্ম। যে ধর্ম ক্রিয়ার ফলে মোক্ষ লাভ করা যায় তাহাই মোক্ষ ধর্ম। "মোক্ষ শব্দের অর্থ হইল— মুক্তি।" বন্ধন না থাকিলে "মুক্তি" শব্দটি নিরর্থক হয়। চক্রবৎ আবর্তনশীল বাসনা ও কর্ম বাসনা হইতে কর্ম ও কর্মের ফলে সংসারে জীব জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ইহাই জীবের বন্ধন। জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই মোক্ষের বা মুক্তির ফলগত অর্থ হইল—

জন্ম-মৃত্যু চক্রের অনাদি-অনন্ত আবর্তন হইতে নিরস্ত হওয়া, জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করা, সংসারে আর জন্মগ্রহণ না করা। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই মোক্ষকে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া হেলায় অমূল্য মানব-জীবন নষ্ট করিও না, মোক্ষ পথে অগ্রসর হও; দৃঢ়পণ লইয়া যাহাতে এই জীবনেই তাহা সিদ্ধ হয়, অবশ্যই তুমি সফলতা লাভ করিবে। ভুলিও না— ঈশ্বর তোমার সহায়। মোক্ষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, কিন্তু উপনিষদে ইহা "অমৃতত্ব" নামে উক্ত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আবশ্যক হয় সাধনা; ধারাবাহিকভাবে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত গুরু নির্দিষ্ট উপায়ে উপাসনার নামই— সাধনা। এই সাধনা যত তীব্র হইবে ফলও হইবে তত সন্নিকট। তবে সংসারীর পক্ষে অধিক তীব্রতার প্রয়োজন নাই— সাংসারিক কর্তব্য করিয়া নিয়ম ও নিষ্ঠা, এই দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, তাহাই অচিরে সফলতা দান করিবে। এই সকল বহুমূল্য উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার শক্তিগর্ভ বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশীল হইত এবং সাক্ষাৎ তত্ত্ব উপলব্ধির সহায়ক হইত। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ভক্তগণ দেখিতে পাইতেন তাঁহাদের চিত্ত অসীম জ্যোতির্ময় চৈতন্যসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং তাঁহাদের চিত্তের বিশালতা ভূমার বিশালতার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের উপদেশের ফল এমনই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ছিল।

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের অকৃপণ আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হউক।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঅন্ধবাবা

কান্ত কবি আমাদিগকে বলিয়াছেন—"তারে দেখবি যদি নয়ন ভ'রে, এদুটো চোখ কর্‌রে কাণা।" যাঁহার বাহিরের চক্ষু ছিল নিমীলিত কিন্তু দয়াল প্রভুর মহৎকৃপায় অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল এবং সেই চক্ষুর দ্বারা যিনি দিনের পর দিন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিলাভের নিত্য দর্শন লাভ করিয়াছেন, যিনি শিবশক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কৃষ্ণ কালীকে সহস্রার পদ্ম মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গের মত পরমানন্দে গাহিয়া বেড়াইতেন—

"তোমার দয়া কি হবে না তারা"?
আর কতদিন ডাকতে হবে?"

— তাঁহার জীবনকাহিনীই মহাত্মামণ্ডলে জ্যোতির্ময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু সীতারাম শ্রীশ্রীঅন্ধবাবার কাহিনী। সে কাহিনী মনোহর এবং অলৌকিক! সেই আলোকসামান্য জীবনের সকল কথা জানিবার উপায় নাই। ভক্তেরা জানিতে চাহিলেই শ্রীবাবা বলিতেন—"এই ঘৃণিত জীবনী নিয়ে কি লাভ হবে বল্?" সময়ে সময়ে ভক্তদিগের পীড়াপীড়িতে তিনি শ্রীমুখে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদবলম্বনে আমি এই মহাত্মার কথা সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

হাজারিবাগ হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত বরহিম গ্রামে কোনও গোপবংশে শ্রীশ্রীঅন্ধবাবার জন্ম হয়। মণি মাহতো ছিলেন তাঁহার পিতা এবং শ্রীযুক্তা নন্দা ছিলেন মাতা। নিজের জন্ম তারিখ বা মাস বা বৎসর সম্বন্ধে তিনি সর্বত্রই মূক থাকিতেন— কিছুই বলিতেন না। একদা কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "যে বৎসর মহরমের দিন খুব ভূমিকম্প হয় তখন আমার বয়স ১২/১৩ হবে। ইংরাজী ১৮৯৭ সালে এই ভূমিকম্পন ঘটিয়াছিল।

"ছয় মাস বয়সে মাতৃহীন, ও তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন" বলিতে গেলে জন্মের অনতিপরেই দুইটি চক্ষুহীন জন্মান্ধ, এই অনাথ বালক কোনও সম্ভ্রান্ত উকিল মহাশয়ের গৃহে "অন্নদাস" রূপে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার শৈশব নানা লাঞ্ছনার মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছিল। অনেক সময়ে নূতন বস্ত্রের মোট তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিয়া দিয়া বলা হইত— "যা কাণা বেটা বাড়ী নিয়ে যা।" "কাণাবেটা" পথে বাহির হইয়াই মা মা বলিয়া অন্তরে রোদন করিয়া উঠিতেন। মাকে বলিতেন—"মা কেউ যেন কাণাবেটার মাথা থেকে কাপড় কেড়ে না নেয়— এ যে আমার মুনিবের জিনিষ। আমি যেন মা কাপড় নিয়ে গাড়ী চাপা না পড়ি।"

অদৃশ্যময়ী মহাশক্তিরূপিনী মা তাঁহার রোদন শুনিতেন। তাঁহার হৃদয় মধ্যে করুণারূপিনীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত। বাবাজী মহারাজ বলিতেছেন— "হ্যাঁ, মাথার কাপড়ের মোট নিয়ে কাণা ব্যাটা একাই গিয়েছে। যখন ভয় হতো, মা অভয় দিতেন।" হাজারিবাগে লালকুঠিতে কতদিন তাঁহাকে রিক্শা টানিয়া শৈশবে জীবিকা অর্জন করিতে হইয়াছে, তাহা শুধু তিনিই জানিতেন, আর জানিতেন তাঁহার মা— যিনি তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। প্রভুগৃহে বালকভৃত্য রাত্রে শয়ন করিতেন। সে ছিল একটি আলোকহীন কক্ষ। রাত্রে যদি প্রস্রাবের বেগ হোত, অন্ধবাবাজী অন্ধকারে দ্বার খুঁজিয়া পাইতেন না। পাছে কক্ষ মধ্যে প্রস্রাব করিয়া ফেলিলে লাঞ্ছনা পাইতে হয় সেই জন্য তিনি মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন, সন্তান বৎসলা তখন স্বয়ং অলক্ষ্যেতে আসিয়া রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। তাই বাবাজী মহারাজ বলিতেন—"এ-ও সত্য। আমার মা আমাকে শৈশব হইতে কৃপা না করলে কাণাব্যাটা কাণাই থাকত— সাধু সীতারাম হ'তো না। মা আমার অর্গল খুলে দিয়ে বলতেন— তোর মা মরেনি। আমি তোর সাথে সাথে থাকি। ডাকলেই পাবি। অন্ধের অন্ধবিশ্বাসের ফলেই পেয়েছে।"

শ্রীশ্রীঅন্ধবাবার কেতাবী শিক্ষাদীক্ষার কোনওরূপ সুযোগ হয় নাই। যাঁহাকে জানিলে সবই জানা হয়, তিনি তাঁহার হৃদয়ে হৃদ্‌কমলের মত প্রস্ফুটিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোনও আক্ষরিক বিদ্যার আর প্রয়োজন ছিল না। তিনি ছিলেন শ্রীভগবানের সেইরূপ একখানি অভিনব প্রতিভূ, যিনি ভূমণ্ডলে ইহাই প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন যে, কেতাবী বিদ্যার অভাব, এমন কি জন্মান্ধতা পর্য্যন্তও ভগবান্ লাভের পরিপন্থী হয় না। তাঁহাকে জানিতে শুধু হৃদয় মনেরই প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় অন্তশ্চক্ষুর— অন্য কিছুর নহে। তাঁহার সেই চক্ষু ছিল এইরূপ যে, তিনি কোনও মোটর গাড়ীর বনেট স্পর্শ করিয়াই বলিতে পারিতেন— সে গাড়ীখানা এসেক্স কি সিল্‌ভরেট— কাহারও পরিহিত বস্ত্রে হাত দিয়াই তিনি বলিয়া দিতেন, উহার পাড় কোন বর্ণের। কোন একটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়াই তিনি এইভাবে তাহার বর্ণনা করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) প্রভাব পূর্ণভাবেই সাধু সীতারামের উপর পড়িয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মত সীতারামও বিভিন্নমুখী সাধনা করিয়াছিলেন। অন্ধবাবাজী একদিন..... বলিয়াছিলেন—"কলিকাতার রামমোহন রায়ের লাইব্রেরীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়।" তখন শ্রীবাবাজীর বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই যে শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি উত্তরে বলিলেন—"তা ভাই, তোমরা যদি না বিশ্বাস কর, তা কি করব। কিন্তু আমি যা বলছি তাই ঠিক।"

মহাপুরুষের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না এবং এক্ষেত্রেও হয় নাই। পরবর্তীকালে উপরিউক্ত ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঅন্ধবাবাজীকে তাঁহার কোনও প্রিয়ভক্ত জিজ্ঞাসা করায় শ্রীবাবা বলিলেন—"শ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) আত্মিক দেহের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে। সেখানে একটা ধর্মসভা হয়। আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় ঠাকুরের

আগমন হয়।” পরে শ্রীবাবা আরও বলিয়াছেন যে—“আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপন্থাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলাম এবং সেই সাধনাকালে তিনি আত্মিক দেহে সর্ব্বদাই আমার কাছে এসে নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন।”

শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁহার সাধনায় সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার সাধনা একজন সাধারণ সাধুর সাধনা ছিল না— উহা ছিল অলৌকিক এবং অ-সাধারণ। দেখিতে পাই যখন হাজারিবাগের সন্নিকটে ভেল্ওয়ারা শিবমন্দিরে তিনি থাকিতেন, তখন একদিন তাহাকেই শিবজ্ঞানে অহিমালা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ফণা তুলিয়াছিল। তারকেশ্বরে আসিয়া তিনি যখন শ্রীশ্রীতারকনাথের মন্দির মধ্যে একাকী নিশা যাপন করিতেন, তখন শব্দ শুনিতেন, বৃহৎ অহিকুল তাঁহার দেহের পার্শ্বদিয়া শন্ শন্ করিয়া এদিক ওদিক চলিয়া যাইতেছে এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে যেন পারিজাত কুসুমের মধুর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। এইভাবে প্রায় পক্ষকাল কাটিল। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ হইয়াছে শীর্ণ ও বলহীন এবং বয়স তখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করে নাই। সর্পভীতি তাঁহাকে এমন আকুল করিয়া তুলিল যে, শ্রীমূর্তিকে অগ্রে করিয়া তারকনাথের সেই জনহীন মন্দির কারায় নিজেকে বন্ধ করা আর সম্ভব হইল না। “একদিন এমন হলো যে খুব জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম। তাঁরই কৃপা, যে বাহিরের লোক কেউ সে কান্নার শব্দ পায় নাই। কেন কাঁদলাম তা জানি না। বোধ হয় আতঙ্কে। তারপর মূর্চ্ছা যাই। জ্ঞান হলে বুঝতে পারলাম কে যেন কানে কানে কি বলছে— অনুস্বার যুক্ত বর্ণ— যার মানে তখন বুঝতে পারিনি। বোধ হলো একটা উজ্জ্বল জ্যোতি সমস্ত মন্দির ছেয়ে ফেলেছে। তারপর সব অন্ধকার। এরপর আর মন্দিরে ঢুকিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য আমি সেখানে যেতাম, একটি ষাঁড় বরাবর আমার সঙ্গে থাক্‌ত। রাত্রে ঘুমুতাম— সে আমার পাশে বসে থাকত। আমি তার গায়ে মাথা দিয়ে রাত কাটাতাম। যদি কোন দিন আমার উঠতে দেরী হতো— সে আমাকে পিঠ হতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে যেত।”

এইভাবে স্বয়ং মহেশ্বর তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পর সেই মন্ত্র চৈতন্যলাভ করিয়াছিল মহাশক্তির কৃপায় বিন্ধ্যাচলের এক আম্রকুঞ্জে। মন্দিরের পথভোলা অন্ধযুবক সাধক আম্রবনেই আপন মনে গান গাহিতেন। সে গান শুনিতেন তিনি আর শুনিতেন তাঁহার মা। একদা নিশীথে সেই অমৃতমধুর মাতৃসঙ্গীত অন্ধের অন্তঃস্থল হইতে নির্ঝরের মত নির্গত হইয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে— এমন সময় সেই সুমহান শৈব মন্ত্রটি তাঁহার কর্ণে বর্ণে বর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—"বর্ণগুলি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে পরস্পর মিশে যাচ্ছে। পাহাড়ে, পর্বতে, আকাশে বাতাসে যেন কেমন একটা খোস্‌বই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল— "জপ কর"।

রাত্রি গেল, দিন আসিল। সাধক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সেই আম্রকুঞ্জেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি যখন এক প্রহর তখন অকস্মাৎ একটি নারী কিছু প্রসাদ লইয়া আসিল এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়া গেল। কে জানে? কে এই দয়াবতী!! যিনি শ্রীশ্রীমাতাবিন্ধ্যাবাসিনীর ক্ষেত্রে সেদিন সেই অনাথ সাধকের মুখে প্রসাদ ঢালিয়া দিয়াছিলেন!!! কয়েকদিন এই ভাবেই সেখানে কাটিল। প্রতি রজনীতে মা-ই যেন সঙ্গোপনে আসিয়া পুত্রকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। একজন সাধুর নিকট তিনি এইখানেই যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী বিন্ধ্যাবাসিনী মাতার মন্দিরে একাকী থাকিবার অনুমতি পাইয়া তিনি পরমানন্দে জপ করিতেন এবং জপ করিতে করিতে মানস নয়নে দেখিতেন—"নানা প্রকার অলৌকিক দেব বিভূতি।" শুধু ইহাই নহে, মাতৃপদলগ্ন সন্তান সেই শ্রীমন্দিরে শেষে মাকেই পাইলেন। আদেশ হইল— "পুত্র তুমি কামাখ্যায় গমন কর"।

শ্রীবাবার নিজের কথায় কামাখ্যার বৃত্তান্ত বলিতেছি—"আমি সেখানে থাকতাম— কুমারীরা আদর করে খেতে দিত। কামাখ্যাতে আমি নয় মাস ছিলাম। সেখানে আমার কোনও অভাব ছিল না। তারপর সেইখানেই যা

কিছু ব্যাপার বৃত্তান্ত সব জানতে পারি। ব্যাপার এই যে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি। কে যেন আমায় বলে দিতে লাগল, আমি বুঝলাম।"

"ভৈরবী মায়াবিনী মা। তিনি সেইখানে আমাকে দীক্ষা দেন। সাত দিন প্রতি বেলায় ৪টি করে আমলকি খেয়ে থাকতাম। এইভাবে একাসনে বসে ৭দিন সাধনা করতে হয়েছিল। মায়াবিনী মা উমানন্দের মন্দিরে থাকতেন। একবার নেমেছিলেন। কুমারীদের তাড়া খেয়ে আমার কাছে আসেন। তিনি বললেন—"আমায় প্রণাম কর্।" আমি প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি বললেন—"যদিও তারকেশ্বর তোমায় দীক্ষা দিয়েছেন, তবুও তোমায় দীক্ষা নিতে হবে।" আমি দীক্ষা নিলাম শক্তি মন্ত্রে।"

মা কহিলেন—"পুত্র বর গ্রহণ কর।"

বাবাজী কহিলেন—"আমি কাণা, চোখ ছাড়া আর কি চাইব মা।"

ভৈরবী মা কহিলেন—"চোখ ত নেবে—বলো, বাইরের না ভেতরের।"

অন্ধ সীতারাম বাষ্পাকুল কণ্ঠে আবেগ ভরে কহিলেন—"মা, ভিতরের।"

মা কহিলেন—পুরীধামে যাও। সেখানে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। পুরীর পথে চলিতে চলিতে অন্ধবাবা কিছুকাল রংপুর এবং প্রায় সাত মাস বগুড়া জেলায় ভবানীপুরে বনাকীর্ণ মা ভবানীর মন্দিরে অতিবাহিত করেন। সেখানে নাটোরের অপূর্ব্ব সাধক রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া যখন নিরন্তর জপ করিতেন, তখন তাঁহার অন্তর হইতে একটা ধ্বনি উঠিত— কালী কৃষ্ণে ভেদ নাই, সব এক— সবই এক। বাবাজী যখন এই তত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন এমন সময় একদিন একটি পাগলিনী সহসা তাঁহার নিকট আসিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—"তাই বটেরে আরও বুঝবি কাণা! একবার পুরীধামে যা। পুরীতে গেলে মা-ও পাবি বাবাও পাবি।"

সুদীর্ঘ সাত মাস ভবানীপুরে সাধনা করিয়া অন্ধবাবাজী পুরীধামে আসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাগরতীর নিবাসী একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী

তাঁহাকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন এবং বলেন—"যেদিন জগন্নাথদেবকে তোমার অন্ধচোখে সাক্ষাৎ দেখতে পাবে, জেনো সেদিন তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে।"

সীতারাম শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর মন্দিরের দিকে চলিলেন কিন্তু অন্ধ, সুতরাং পথ হারা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহে পথের ধারে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি বালক আসিয়া তাঁহার কর ধারণপূর্বক শ্রীমন্দিরে লইয়া আসিল। অন্ধবাবা অবসন্ন দেহে মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরই কে একজন আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া গেল। ইহাকেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন— নিত্যযুক্ত অবস্থা। যাঁহারা ভগবানে নিত্যযুক্ত তাঁহাদের যোগ এবং ক্ষেম ভগবান নিজেই বহন করেন। এইভাবে পুরীর মন্দিরে কয়েকদিন কাটিল। অন্ধসাধু একদিন স্বপ্নে শুনিলেন কেহ যেন বলিতেছে—"আমি চোখ এনেছি— তোর চোখ নে—।" সাধু কহিলেন,—"এখন নেবো না। যখন মন্দিরে যাবো তখন যেন দর্শন পাই।"

পরদিন অভ্যস্ত পথে শ্রীমন্দিরের ভিতরে যাইতেই দেখিলেন, কি অপরূপ দর্শন প্রাণবিমোহন শ্রীমূর্ত্তি! তিনি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীবাবাজী বলিয়াছিলেন—"এখন মন্দিরে তোমরা যেমন দেখ, আমিও তেমন দেখি।"

অন্ধসাধুর নয়ন দুইটি যে ছিল অতিশয় উত্তম তাহা দেখিয়া একদিন দেওঘর করণীবাগের ব্রহ্মচারীরাজ স্বামী বালানন্দ বলিয়াছিলেন—"কৌন্ কহ্‌তা হ্যায় তুম্‌হে সুরদাস? তোঁহারি দোনো আঁখে তো খুলি হুঁয়ী হেঁ।

পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমাতা ও শ্রীশ্রীমদনমোহন যুগল মূর্তি স্থাপনা করিয়া সাধু সীতারাম তাঁহার জন্মভূমিতে "নাম" মাহাত্ম্য কীর্তন করেন এবং দীন দরিদ্র ও পতিতের উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়া "আনন্দ ভবন" নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৯৩২ সালের ২২শে এপ্রিল শুক্রবারে ঠিক ৯ ঘটিকায় তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঅন্ধবাবা ছিলেন আমার মাতামহের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব। আমার মাতৃদেবীও তাঁহাকে গুরুদেব মানিতেন। এঁনারই কৃপায় আমার মাতৃদেবী তাঁহার নিজের চক্ষুদুইটি ফিরিয়া পান। শৈশবে গরম ফুটন্ত জল দিদিমায়ের হাত ফস্কাইয়া মাতার চোখে পড়ায়, চোখের মণি গলিয়া যায়। বহুদিন অনেক বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসা সত্ত্বেও চোখ অন্ধই রহিয়া গেল। যখন সব ডাক্তাররা আশা ছাড়িয়া দিলেন তখন দিদিমা শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। একদিন স্বপ্নে দিদিমা শ্রীগুরুদেবের দৈবাদেশ পাইলেন— "আমার পাদুকা ধোওয়ানো অমৃত বারি তোমার মেয়ের চোখে দাও।" তার পর হইতে কয়েক মাস যাবৎ পাদুকা ধোওয়া জল আমার মাতৃদেবীর দুই চক্ষে দেওয়া হইত। ক্রমশঃ বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই দেখা গেল যে চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই বিশ্বাস করি মহাত্মাগণ আজও আছেন। এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার মাতার চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি অটুট আছে। এই মহামানবের নিকট আমার নিজস্ব সাধন জীবনেও অপার সহায়তা লাভ করিয়াছি। তাঁহার দিব্যদেহ, আত্মিক শরীর আমাকে সাধনার গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁর অপার কৃপাপূর্ণতায় আমি ধন্য। তাঁর মহান আত্মার প্রতি জানাই আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাবনত প্রণাম।

করুণাময়ী শ্রীশ্রীরাঙামা

সেই অসীম রহস্যময় লীলাচ্ছলে সৃষ্টি করিয়াছেন এই চরাচর জগৎ। সৃষ্টি মধ্যে সর্বত্র তাই তাঁর লীলার প্রকাশ। সৃষ্টিধারার নিয়মানুযায়ী যুগযুগান্তব্যাপী যখন জীবের প্রাণ মায়ার আবরণে ঢাকা পড়ে তখন সেই লীলাময় তাঁর আপন সত্তার অংশ প্রেরণ করেন এই ধূলার ধরণীতে, তিনি জন্ম নেন সাধারণ জীবের ঘরে অতি সাধারণ ভাবে। হাওড়া জেলার বাঙ্গালপুর গ্রামের এক অতি সজ্জন ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়। একদা তিনি স্বপ্ন পেলেন—এক মহাজটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাঁকে বলছেন— "মহেশচন্দ্র, তোমার কন্যারূপে আসছে একজন বিশেষ জন। তাকে অতি যত্নে লালন পালন করিও। তাকে মাতৃদুগ্ধ পান করাইও না— গোদুগ্ধ পান করাইবে।" তখন কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় ছিলেন মহেশচন্দ্র, তার পরের দিনই নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন যে তাঁহার পূর্ণ গর্ভা স্ত্রী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী সত্যই এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। অষ্টম গর্ভের এই কন্যাকে দেখিয়া মহেশচন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া মেয়ের নাম রাখেন— "সুধামুখী"।

সুধামুখী ক্রমশঃ বড় হয়। জগন্মাতার অংশ নিয়া জন্ম হইলেও নিজ সৃষ্ট লীলার এমনই শক্তি যে স্থূলদেহ ধারণ করিলেই জীবাত্মা, মহাত্মা সকলেই ক্ষণিক সময়ের জন্যে মায়ার বশবর্তী হন। মায়ার বশবর্তী হইলেই সত্তা তাহার স্ব স্বরূপ ভুলিয়া যায়। তাই সাধারণ শিশুর মতোই হেসে কেঁদে বড় হয় সুধামুখী। কিন্তু নিজ গৃহে অধিষ্ঠিত গৃহদেবতা সিংহবাহিনী তাকে অহরহ আকর্ষণ করিতে থাকেন। ঐ বয়সী অন্যান্য মেয়েরা সাধারণত পুতুল লইয়া সংসার সংসার খেলিতেই উন্মুখ হয়, কিন্তু সুধামুখী তখন দেবী সিংহবাহিনীর

ঘরেই ব্যস্ত থাকে। তিনি তখন ঠাকুরকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, কখনও বা চন্দন ঘষিতেছেন, ঠাকুরকে সাজাবেন, এইভাবে সর্বদাই ঠাকুর লইয়া খেলা। একদিন মন্দিরের পূজারীর চোখে পড়ে যায় সুধামুখীর খেলা। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুধামুখীকে মারিতে আসেন। তখন ভীত সন্ত্রস্ত সুধামুখী ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহের আড়ালে গিয়া লুকাইলেন। এইবার মহামায়ার আসন টলিয়া উঠিল। মহামায়া নিজের জ্যোতি লইয়া প্রবেশ করিয়া যান সুধামুখীর অন্তরে, আর তখন কানে কানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে বীজমন্ত্র। সেই মহামন্ত্রই সুধামুখীকে সমাধি অবস্থায় নিয়া যায়। টলিতে টলিতে মহাঘোরের মধ্যে কোন রকমে বাড়ী আসে সুধামুখী। আসিয়াই বিছানায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে। মাতা গিরিবালা ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন—সুধা ঘোর অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় শুইয়া আর বিরাট একটি বিষধর সর্প তার মাথার কাছে ফণা বিস্তার করিয়া স্থির হইয়া আছে। এই দেখিয়া গিরিবালার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু ভয়ে কেহই আর সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। এইভাবে কাটিল তিন দিন তিন রাত্রি। এই ঘটনার কিছুদিন পর এক সন্ন্যাসী আসেন মহেশচন্দ্রের বাড়ীতে। সুধামুখীকে দেখিয়াই তিনি চমকিত হইয়া উঠেন—"কে মা—কে তুই—তুই তো দেখি সাক্ষাৎ জগন্মাতা।" মহেশচন্দ্রকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"ওরে এযে সাক্ষাৎ মহামায়ার অংশ। এর বিয়ে দিস না, তাহলে মায়ের আমার ভারি কষ্ট হবে।" সেই মহাজটাজুটধারী মহাতপস্বীকে কথা দেন মহেশচন্দ্র—না। দেবেন না তিনি সুধামুখীর বিয়ে। কিন্তু যে এসেছে জগৎকে তরাইতে সে তো এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই নিজেকে নিয়া যাইবে। তাই মহেশচন্দ্রের দেহান্তের পরে বৈমাত্রেয় বড় ভাই সমাজের ভয়ে ও চাপে সুধামুখীর বিবাহ দেন। কিন্তু অহর্নিশি ভাব সমাধিগ্রস্থ বৌ-এর কপালে জোটে অমানুষিক উৎপীড়ন, ঠিক সমাধি না ভান, দেখিতে গিয়া সুধামুখীর গায়ে পড়ে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, কখনও বা নোড়ার ঘা— কিন্তু বধূবেশে এ কে? এ যে পরম করুণাময়ী মা;

তাই তিনি সব আঘাত লন হাসি মুখে। পাশের বাড়ীতে থাকেন মুখুজ্জ্যে পরিবারেরা। তাদের আট বৎসরের ছেলে "কাউর" তাকে বলা হ'ল "একে তুই কাকিমা বলে ডাকবি।" কিন্তু অমন উজ্জ্বল রাঙা জবার মত গায়ের রং দেখিয়া কাউর বলিল—"না কাকিমা বলে ডাকবো না, ডাকবো "রাঙামা" বলে। সেই থেকেই সুধামুখী হলেন "রাঙামা"।

এই করুণার প্রতিমূর্ত্তি রাঙা মা রোগমুক্ত করলেন ঐ কাউরের মাকে, যিনি কিনা চার বৎসর ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। রোগমুক্তির সাতদিনের মধ্যে কাউরের মা পায়ে হেঁটে চলে যান কালী বাড়ীতে; আর তার প্রারব্ধজনিত বোঝা হাসি মুখে নীরবে নিজের উপর লইলেন করুণাময়ী শ্রীশ্রীরাঙামা।

শ্বশুরালয়ে মা কিন্তু নীরবে ঘরের কাজ করেন— জল তোলেন বাটনা বাটেন, রান্না করেন, অতিথি অভ্যাগতদের পরিতোষপূর্বক খাওয়ান। কেহ বুঝিতেও পারে না যে শ্রীমায়ের মনে লুকিয়ে আছে মকরন্দ। ধীরে ধীরে মাতৃমূর্তির প্রকাশ হইতে লাগিল। মাতৃমূর্তি প্রকাশের সাথে সাথে মায়ের মনে জাগিল ভ্রমণের সখ। তখন খসিয়া পড়িল বৌ বৌ খেলাঘরের খেলার সাজ। তখন কেই বা স্বামী আর কেই বা পুত্র। স্বামী মাঝে মাঝে বাধা দেন কিন্তু কে কাকে আটকাইবে? বৎসরের মধ্যে সাত মাসই যে বউ বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমন বউকে লইয়া সংসার অচল। একবার স্বামী জোর করিলেন, "না এখন দুলালের ১০২° জ্বর। এখন বাইরে যাওয়া চলবে না।" মা বলিলেন—"ওর জ্বর কালই ভাল হয়ে যাবে। আমায় যে জগন্নাথদেব ডাকছেন, আমি তো আর থাকতে পারবো না।" ছেলের জ্বর কাতর মুখের পানে চাহিয়া স্বামী রামনাথের মন মানে না। চারপাশের দরজায় চাবি দিয়া তিনি বউ ছেলের পাহারায় রহিলেন। পুরানো দিনের বাড়ী আর বাড়ী হইতে বাহির হইবার একটি মাত্র দরজা। কোথা দিয়া বাহির হইবেন? কিন্তু জগন্নাথ যে ডাকছেন— তবে উপায়? খাটা পায়খানায় বসিয়া মা চিন্তা করিলেন; হঠাৎ মনে হইল, এই তো উপায়

আছে। এই গামলাটা সরাইলেই তো একজনের দিব্যি বেরোবার পথ হয়। গায়ে একটু ময়লা লাগিতে পারে। তা লাগুক। যা ভাবা তাই কাজ। গামলা সরাইয়া খাটা পায়খানার সেই স্বল্প পরিসর স্থান দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন মা। গায়ে কিছু ময়লাও লাগিয়াছিল। গঙ্গায় স্নান করিয়া মা চলিলেন মা কালীর বাড়ী। পিছনে পড়িয়া রহিল জ্বর কাতর পুত্র আর অভিমানগ্রস্ত স্বামী। মা কালীর বাড়ীতে প্রণাম সারিয়াই মা চলিলেন পুরীধামের পথে। চলার পথে জুটিয়া গেল কয়েকজন ভক্ত ছেলে মেয়ে। যেমন মা তার তেমন ছেলেমেয়ে। পুরীতে পৌঁছিয়াই মা চলিলেন জগন্নাথ দর্শনে; দর্শন শেষে মা কেমন ভাবাবেশে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সম্মুখে আসিল রাধারমণ কুঞ্জ। সেখানে এক সৌম্যমূর্তি সাধু বসিয়া আছেন। সাধু মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার যে মা এখনও আনুষ্ঠানিক দীক্ষা হয়নি।" মা বলিলেন—"না বাবা এখনও আনুষ্ঠানিক দীক্ষা হয়নি। মা নিজে আমার কানে বীজমন্ত্র দিয়েছেন।"

সাধু বলিলেন—"সেই মন্ত্রই আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমায় দেবো।" সাধু মায়ের কানে কানে মন্ত্র দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মা গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। সঙ্গের ছেলে মেয়েরা একটু পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা মায়ের কাছে আসিয়া এমত অবস্থা দেখিয়া তো চিন্তায় পড়িল। একটু ঘোর কাটিতেই সকলে ধরাধরি করিয়া মাকে নিকটস্থ এক বাড়িতে লইয়া গেল। তিন দিন তিন রাত্রি মা তথায় সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। সমাধি অন্তে সকলে জিজ্ঞাসিল—"কোন্ সাধু তোমায় আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দিল?" মা বলিলেন—"তা তো জানি না। মা যে মন্ত্র দিয়ে ছিলেন, তিনিও সেইমন্ত্রই দিলেন; কানে শুনলাম আর খেয়ালের ঘরে ডুবে গেলাম। এরপর একদিন কলিকাতার পথে একটি দোকানে এক সৌম্যদর্শন সাধুর ছবির দিকে তাকাইয়া মা উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই তো এই তো সেই সাধু; যিনি পুরীতে আমার কানে মন্তর দিয়েছিলেন।" ইনি আর কেউ নন—ইনিই প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। ছেলে মেয়েরা শুনিয়া তো অবাক। কারণ ইনি আজ দশ বৎসর হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এক ভক্তসন্তান একদিন মাকে বলিয়া বসিল—"মা পাঁজিতে দেখলাম তারাপীঠ বলে এক তীর্থ আছে; সীদ্ধপীঠ, রামপুরহাট স্টেশন থেকে নেমে আট নয় মাইল বড় দুর্গম রাস্তা তারাপীঠ! মহাতীর্থ।" এই কথা শোনার পর মাকে আর আটকায় কে? মায়ের ইচ্ছে আর তারা মায়ের আকর্ষণ! এ যেন চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি। দুর্গম পথ? মায়ের নিকট কোনও পথই যে দুর্গম নয়। ১৯২৮ সালের এক ভরা বর্ষা। রামপুরহাট স্টেশনে নামিয়া, সেই ভাঙা চড়াই উৎরাই দুর্গম রাস্তা পার হইয়া মা আসিয়া পৌঁছিলেন ওপারে—দ্বারকা নদীর পারে। শ্মশানের কাছে। বর্ষাকালে দ্বারকানদী উত্তাল অবস্থায় আছে। তাহারা পার হইবেন কি করিয়া? যিনি নাকি সহস্রকে পার করাইবার ভার লইয়াছেন, তাঁর আবার পারাপার হইবার ভাবনা? অকস্মাৎ কোথা হইতে এক পাগলা বাউল মাঝি ডোঙ্া নিয়া আসিয়া হাজির হয়। শ্রীশ্রীমাকে ডোঙ্গায় তুলিয়া লইয়া পারাপার করিয়া দিল। নদী পার হইয়া শ্মশানে পা দেন রাঙামা। সে কি শ্মশান! যতদূর দৃষ্টি যায় খাঁ খাঁ করিতেছে নিস্তব্ধতা। চারিপাশে মড়ার মাথা আর মৃত মানুষের হাড়। তারই মাঝে মহামুনি বশিষ্ট দেবের সাধন পীঠ। এই মহাশ্মশানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন বর্তমান যুগের আর এক মহাসাধক "বামাক্ষ্যাপা"। এই তারাপীঠে কত লীলাই না করিয়াছেন মা। সন্তান প্রেমের কত নিদর্শনই না সেথায় রাখিয়া গিয়াছেন মা। পরবর্তীকালে মায়ের ইচ্ছায় স্থাপিত হয় তারাপীঠে মায়ের বাসগৃহ।

মা যখন যেখানে যান সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এক ঢেউতোলা অপার আনন্দ। সে এক অনির্বচনীয় ভাবের বন্যা বইতে থাকে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে। কালীঘাটের নকুলেশ্বর তলায় রাঙামায়ের ছিল নিত্য যাতায়াত। এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গোয়ালিয়রের লালবাবার। শ্রীশ্রীমা

তাঁহাকে "ভাইয়া" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও আহার করাইতেন। সুধামুখী শ্রীশ্রীরাঙা মায়ের মুখশ্রিত সুধামাখা "ভাইয়া" ডাক লালবাবা আজও ভুলতে পারেন না।

রাণাঘাট— মায়ের আর এক লীলাভূমি। রাঙা মা রাণাঘাটে আসিলে যেন সমস্ত শহর ভাঙিয়া পড়িত, এত লোক যে কোথা হইতে আসিত কে জানে?

এই রাঙামা কে ছিলেন? আর কি ছিলেন তাহা কেউ জানিত না। নিজেও কোন দিন মা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। বিহারের ছাপরা জেলার শিওয়ান গ্রামে "হরখড়ি" বাবা নামে এক উন্নত অবস্থার মহাত্মা ছিলেন। গঙ্গাতীরেই ছিল তাঁহার আশ্রম এবং গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য লোক ছিল তাঁহার ভক্ত। পণ্ডিতজী (পণ্ডিত পুরুষোত্তম আচার্য্য) এবং তাহার দাদাও ছিলেন ভক্তবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত "হরখড়ি" বাবা দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে একদিন বলেন—"বাংলাদেশে এক দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন অতি প্রচ্ছন্নভাবে। ইনি সাধারণ গৃহস্থ বেশে থাকেন এবং সহজে তাঁকে চিনবার উপায় নাই। রামায়োনোক্ত শবরী মাতার অবতার তিনি। কিন্তু তোমরা তাঁর সঙ্গ পাবে। ১২ বৎসর পর সেই দেবী এই আশ্রমে আসবেন এবং আমার সমাধির চারিদিক ঘুরে এই আম্র বৃক্ষমূলে বসবেন। যে বাঙ্গালী মাতা এখানে এসে এইরূপ করবেন তাঁকেই সেই দেবী বলে জানবে।" একথা বলিবার পর সাধক মহাত্মা তাঁর জনৈক ভক্তের আজ্ঞাচক্রের উপর অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া তাহাকে সেই দেবী মূর্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন। ১২ বৎসর পার হইয়া গিয়াছিল, "হরখড়ি" বাবার ভক্তবৃন্দ ভাবিয়া ছিলেন যে সাধকের ভবিষ্যৎবাণী বোধহয় সফল হইল না। শ্রীশ্রীমায়ের এক ভক্তসন্তান কাউরকে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে শিওয়ান গ্রামে যাইতে হইল; সেখানে কাউরের ডাকে মাও শিওয়ানে বেড়াইতে গেলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে মা তাঁর অন্যতম ভক্ত

শ্রীমান প্রবোধকে লইয়া আপন খেয়ালে হরখড়ি বাবার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মা হরখড়ি বাবার সমাধির চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। তারপর নিকটবর্তী এক আম গাছের তলায় গিয়া বসিলেন। আশ্রমের ভক্তগণ এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেই প্রধান ভক্তকে খবর দিলেন। সেই ৭৮ বৎসরের প্রবীণ ভক্ত, মাতৃ সমীপে আসিয়া বারংবার মা কে দেখিতে লাগিলেন ও বলিলেন—"হড়খড়ি বাবা চৌদ্দবছর পূর্বে তার আজ্ঞাচক্র স্থানে যে ঈশ্বর মূর্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন, তুমিই তো সেই দেবী মূর্তি।" রাঙামায়ের তখন সে কি সলাজ মূর্তি। মা বারবার বলিতে লাগিলেন—"না বাবা তোমাদের বোধ হয় কিছু ভুল হচ্ছে। সেই মহাত্মা হয়ত মা আনন্দময়ী মায়ের কথা বলেছেন।" তখন সেই প্রবীণ ভক্ত বলিলেন—"না না মা, সে মূর্তি আমার মানস পটে সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা আছে। তুমিই সেই, তুমি সেই।"

এত পূজা এত ভক্তি পাইয়াও সুদীর্ঘ ৮২ বৎসর মা সেই একইভাবে কাটিয়ে গেলেন। বাহির হতে দেখিলে মনে হইত যে মা ঘোরতর সংসারী, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখিলেই বোঝা যাইত যে সংসারটা তিনি পদ্মপাতায় জলের মত টলটল করছেন।

শ্রীশ্রীরাঙামা সুদীর্ঘ ৮২ বৎসর অগণিত ভক্তসন্তানকে শিখালেন—প্রেম, মমতা, বাৎসল্য আর নিরভিমানতা। সবই শিখালেন তিনি, শুধু বুঝি একটি বিষয় শিখানো বাকী ছিল যে "মৃত্যু কত মধুর"। একদিকে জীবন আর অন্যদিকে মৃত্যু—কত সহজ, এ যেনো এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। পুরো চারমাস ব্যাপী একভাবে রোগ ভোগের পর ২২শে মার্চ ১৯৭৫ সাল, পুত্র বধূ কমলাকে ডাকিয়া মা বলিলেন—"আর তো থাকব না। কাল রাতে সুধীর, কমল প্রভৃতি ছেলেরা এসে কথা নিয়ে গেল।" কাহারা কথা লইয়া গেল? কমল দেহ রাখিয়াছে প্রায় ৩০ বছর পূর্বে, সুধীর দেহ রাখিয়াছে ১০ বছর পূর্বে। অর্থাৎ নাতি প্রশ্ন করে—"কেন ঠাকুমা, কি কষ্ট হচ্ছে বলুন না।

যাবার কথা কেন বলছেন।" উত্তরে মা বলেন—"নারে, কোনও কষ্ট নেই—কথা দিয়েছি কিনা তাই।" সারা জীবন এত দেখেও বিশ্বাস করে না সেই নাতি, বলে—"এত অসুখ আজ দুদিন পাশ ফেরেননি। এত ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে তবুও বলছেন মা কোনও কষ্ট নেই?" এত রোগ ভোগের পরও কাছে ডাকেন, বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন মা—"কেন তুই বিশ্বাস করিস্ না যে কষ্ট মানুষের দেহে হয় না— কষ্ট হয় মানুষের মনে, আর মনে আমার কোনও কষ্ট নেই।" কি ছিল সেই হাত বোলানোর মধ্যে? বিশ্বাস হয়। বিস্ময়ে হতবাক নাতি সজল চোখে বলে "যদি থাকতে হয় তবে উঠে বসুন। যদি যেতে হয় তবে যান। আপনার কষ্ট না হলেও আমরা আর দেখতে পারছি না। এ খেলা বন্ধ করুন।" মা বলেন "খেলার এখন কি দেখেছিস—আরও কত খেলাই দেখবি।"

তারপর এল স্থূল খেলার শেষ দিন। ১৩৮১ শনিবার ১৫ই চৈত্র, সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীরাঙামা নরলীলা সংবরণ করিয়া মহাসমাধিস্থা হইলেন। অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল ভক্তসন্তানদিগের চোখে। মাতৃকরুণা ধারায় সিঞ্চিত হইয়া করজোড়ে তাহারা মায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করিলেন—

"জীবন দিয়ে যে শেখালে তুমি মা,
মৃত্যু সে কোনো যতি নয়।
তবু কেন আজও অন্তর মোর
কাঁদে বিচ্ছেদ বেদনায়।।"

(শ্রীশ্রীরাঙামায়ের জীবনী গ্রন্থ হইতে সংকলিত)

সন্তের মহিমা

আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। সেবার নদীয়া জেলার নবদ্বীপ নগর মহাপ্লাবনের কবলে কবলিত। চতুর্দিকে জল শুধু জল, তারই মধ্যে গঙ্গার নিকটস্থ কোনও এক দ্বিতল গৃহের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া এক কিশোরী সেই মহাপ্লাবনের ভয়াল দৃশ্য দেখিতেছেন। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইবার সময় হঠাৎ কিশোরীর লক্ষ্য পড়িল এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার!!— খেয়াঘাটের সন্নিকটে গঙ্গাতীরস্থ নূতন চড়ায় একটি কুটীর। সেই কুটীরের চারিপার্শ্বে কোনও জল উঠে নাই। কুটীরটি অটল অবস্থায় মহাপ্লাবনেও নির্বিকারভাবে সমাসীন।

উপরিউক্ত ঐ অত্যাশ্চর্য কুটীরের মালিক হইলেন এক বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ। এঁনার বয়স কেহ অনুমান করিতে পারেন না। উপরিউক্ত কিশোরীর ভাষায় ইনি হইলেন একজন "ঠুক্‌ঠুকে বুড়ো"। এই বৈষ্ণব মহাত্মা নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে নতুন চড়ায় একটি কুটীরে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন।

তখন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত রাম চট্টোপাধ্যায়। উপরিউক্ত কিশোরী হইলেন এই ডাক্তারের স্নেহধন্যা বড় কন্যা। এই ডাক্তারবাবুর নিজ গৃহের গমনাগমনের পথেই বংশীদাস বাবাজীর ভজন কুটীর পড়িত। মহানুভব মহাত্মা মহাশয় ডাক্তারবাবুকে খুবই স্নেহ করিতেন। বাবাজীর নিকট বেশী লোকজন যাতায়াত করিতে সাহস করিত না। কারণ, মহারাজ লোকজন দেখিলেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতেন, ভয় দেখাইতেন, ক্রোধ দেখাইতেন ইত্যাদি। তাই দূর হইতেই মহাত্মাকে বেশীরভাগ লোক নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইত। এই মহাত্মার ভজন কুটীরের

ভিতর কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। ইনি নিজ সাধন, ভজন ও পূজন লইয়াই সদাসর্বদা মগ্ন থাকিতেন। শ্রীশ্রীবাল্ গোপালের একটু বড় বিগ্রহ সবসময় তাঁহার পাশে থাকিত আর মহাত্মা অবিরত গোপালের সহিত বার্তালাভ করিয়া যাইতেন। গোপালের সহিত তাঁহার কথপোকথন শুনিলে বোঝা যাইত না যে, কে যে প্রকৃত গোপাল—তিনি স্বয়ং, না শ্রীবিগ্রহটি। ডাক্তারবাবুকে মহাত্মা খুব স্নেহ করিতেন বলিয়া মাঝে মধ্যে ডাক্তারবাবু মহাত্মার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুশল সংবাদ লইতেন।

নবদ্বীপে খেয়াঘাটের নিকটস্থ চাঁপা ফুল গাছের বন ছিল। এখানকার নিবাসীগণের নারায়ণকে চাঁপা ফুল পুষ্পাঞ্জলি দিবার রেওয়াজ আজও চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা বাবাজীও তাঁহার বাল্ গোপালের পূজার নিমিত্ত প্রত্যহ চাঁপা ফুল সংগ্রহ করিতে চাঁপা বনে যাইতেন। প্রতিদিন ভোর রাত্রে ব্রাহ্ম মুহূর্তে বাবাজী অন্ধকারেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া চাঁপা বনের দিকে আসিতেন। চাঁপা পুষ্পের গাছের ডাল খুব কোমল এবং নরম হয়। আম, জাম, কাঁঠাল গাছের মত অত মজবুত শক্ত ডাল হয় না। চাঁপা বনের দিকে যাইতে হইলে ডাক্তার বাবুদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে হয় এবং ফুলের বনও ডাক্তারবাবুদের বাড়ীর সন্নিকটেই ছিল। প্রত্যহ এই মহাত্মাকে দর্শন করিবার জন্যে ডাক্তারবাবুও ভোররাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাবাজী মহারাজকে লক্ষ্য রাখিতেন। তখন বর্ষাকাল। সদ্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছতলাগুলি সবই খুব পিচ্ছিল। প্রত্যহ যেমন বাবাজী ফুল চয়ন করিবার জন্যে আসেন, সেই দিনও নির্দিষ্ট সময়ে মহাত্মাজী গাছে উঠিয়াছেন; যেমনি বাবাজী গাছে চড়িয়া ডালের উপর পা দিয়াছেন অমনি গাছের ডাল ভাঙিয়া ঝপাৎ করিয়া ভীষণ এক আওয়াজ হইল এবং বাবাজী মহারাজ ভূমিতলে ভীষণ জোরে পড়িয়া গেলেন। আর এদিকে ডাক্তারবাবুও সজাগ ছিলেন। যেই ডাক্তারবাবু পড়িয়া যাইবার আওয়াজ পাইলেন তৎক্ষণাৎ তিনি চাঁপা তলায় আসিয়া বাবাজীকে ধরাধরি করিয়া বসাইলেন। তখন বাবাজী

গোপালকে উদ্দেশ্য করিয়া নিজেকেই গালি দিয়া চলিয়াছেন—"হালার বেটা হালা (অর্থাৎ শালার বেটা শালা), এত রাতে তোর গাছে উঠতে যাওয়া কেন? তখনি বললুম পড়বি, পড়বি; উঠিস্‌না। তা কথা শুনলে না। ব্যস্‌; এখন শালা পড়েছে। পা দুটোও বোধহয় গেছে নাকি? ডাক্তার?"

ডাক্তারবাবু দুটো পায়ের হাঁটুই ভাল করিয়া দেখিলেন; দুটো হাঁটুই টুকরো টুকরো হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। একটা পায়ের নিম্নাংশের হাড়ও ভাঙিয়াছে। ডাক্তারবাবুর মনে হইল "বোধহয় আর কোনও দিনও বাবাজী মহারাজ চলিতে পারিবেন না।" যেমনি এই কথা ভাবা অমনি বাবাজী বলিতে লাগিলেন—"অত চিন্তা কিসের র‍্যা? যে শালা ভেঙেছে সে শালা সারাবে। যেমন ভেঙেছে তেমনই সারাবে। তুমি বাপু ঘরে যাও। কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ডাক্তারবাবু বাবাজীকে গৃহে লইয়া আসিয়া দুই পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। তারপর অন্যান্য বড় বড় সব ডাক্তারের কথা বলায় বাবাজী কিছুতেই রাজী হইলেন না। তখন ডাক্তারবাবু বাবাজীকে কোনমতে কুটীয়ায় পৌঁছিয়া দিয়া আসিলেন। তারপর প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে, বাবাজী মহারাজ ঘর হইতে বাহিরে পদার্পণ করেন নাই।

এরপর একদা রাত্রে ডাক্তারবাবু রোগী দেখা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, বাবাজীর কুটীরের নিকটে আসিবামাত্র তিনি শুনিতে পাইলেন যে বাবাজী গোপালকে বলিতেছেন—"বেটাচ্ছেলে কোথাকার? হাগার আর সময় পেলি না! এত রাত্রে তোর পায়খানা পায় কেন? রাতে ভাল করে দেখা যায় না আর এই অন্ধকারেই শালা হাগ্‌তে যাওয়া! চল্‌ বেটা শালা।" এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহারাজ শ্রীগোপালকে কানে ধরিয়া তুলিয়া সোজা হইয়া অতি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটিয়া শৌচ ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুতো এইসব লীলা দেখিয়া অবাক্! তিনি ভাবিলেন, "বাবাজীর পা দুখানা কী একেবারেই ঠিক হইয়া গিয়াছে?" ডাক্তারবাবু এও জানিতেন যে গোপালকে কানে ধরিয়া শৌচ করাইবার জন্যে লইয়া গেলেও

বাবাজি স্বয়ংই শৌচ সারিয়া আসিবেন। বরাবরই শ্রীগোপালকে পাশে বসাইয়া বাবাজী নিজে মলত্যাগ করিয়া আসিতেন। এই ছিল এই বিকারহীন পুরুষের এক অদ্ভুত খেলা, অদ্ভুত সাধনা। শৌচান্তে বাবাজী মহারাজ আসিলে ডাক্তারবাবু পা দেখিতে চাহিলেন। বাবাজী মহারাজ পা দুখানি দেখাইয়া বলিলেন—"বলেছি না, যে শালা ভেঙেছে সে শালা সারাবে।" ডাক্তারবাবু দেখিলেন যে পা দুখানি ঠিক পূর্বাপর হইয়া গিয়াছে। কখনও যে দুটি পা ভাঙিয়া গিয়াছিল, ইহার চিহ্নমাত্রও নাই।

তারপর একদিন রাস্তায় দেখা গেল মহাসংকীর্তনের দল বাহির হইয়াছে। সংকীর্তনের দলের মধ্যে চারিজন একখানি বাঁশের খাটিয়া (মৃত ব্যক্তিকে বহন করিবার জন্যে যাহা ব্যবহৃত করা হয়) বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই খাটিয়ার উপর শ্রীবংশীদাস বাবাজী বসিয়া আছেন। ব্যাপার আর কিছুই নহে, এই মহাত্মা নবদ্বীপের নিকট গুপ্ত বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকালিকা মন্দির পোড়ামা তলা দর্শন করিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাসমারোহে বাবাজী মহারাজকে গুপ্ত বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে কীর্তন দল লইয়া চলিয়া গেল। গুপ্ত বৃন্দাবনে পৌঁছিবার দ্বিতীয় দিনেই মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার দেহত্যাগ করিলেন।

উচিত শিক্ষা

বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীশ্রীলোচনদাস বাবার বহু শিষ্যদের মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদাস বাবা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাই ওঁনাকে অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ খুবই ঈর্ষা করিত। সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীলোচনদাস বাবা ইহা জানিতেন। শ্রীশ্রীলোচনদাস বাবার আশ্রমে শ্রীরবিদাসবাবা বলিয়া একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সবসময়েই দুর্গাদাসবাবাকে খুব ঈর্ষা করিতেন। তাহার ঈর্ষাভাব মনের মধ্যে এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহার জপ-ধ্যান ঈশ্বরীয় চিন্তা সবই পণ্ড হইতে লাগিল। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুলোচনদাসবাবা শিষ্যের মানসিক অবস্থার বিষয় সবই জানিতে পারিলেন। একদিন শ্রীশ্রীলোচনদাসবাবা চার-পাঁচ জন শিষ্যকে বলিলেন—"চলো, আমরা আজ একটা জায়গায় যাইব।" চার-পাঁচ জনের মধ্যে দুর্গাদাসবাবা ও রবিদাসবাবাকেও সঙ্গে নিলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ছাপাইয়া রাত্রি নামিয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীলোচনদাস বাবা শিষ্যদের লইয়া শ্মশানভূমিতে উপনীত হইলেন। শ্মশানের মধ্যে জ্বলন্ত চিতায় মৃতদেহ জ্বলিতেছে। শিষ্যরা ভাবিতেছেন—'এত জায়গা থাকিতে শ্রীশ্রীবাবা আবার শ্মশানে তাহাদের লইয়া আসিলেন কেন?' অল্পসময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীবাবার শ্মশানে আসার রহস্য উদ্‌ঘাটন হইয়া গেল। প্রজ্বলিত চিতাগ্নি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা শিষ্যদের প্রতি বলিলেন—"দেখো! ঐ শবদেহ আগুনে পুড়িতেছে। তোমরা ঐ জ্বলন্ত শবদেহটিকে লইয়া খাওগে। ইহাই আমার আদেশ।" কিন্তু দেখা গেল যে অন্যেরা কেহই যাইতে পারিল না। এক একজনের মনের মধ্যে এক এক প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। রবিদাস ভাবিলেন—"এ আবার কেমন

নির্দ্দেশ? জ্বলন্ত মরা দেহ কেহ খাইতে পারে না কি? এগুলি শিষ্যদের মানসিক যাতনা সৃষ্টি করা। ইত্যাদি।" যখন রবিদাস এসব ভাবিতেছেন, হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে দূর্গাদাসবাবা ততক্ষণে শবদেহের নিকটে গিয়া শবের একখানি ঠ্যাং ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অবাক হইয়া অন্যান্যদের সঙ্গে রবিদাস দেখিতে লাগিলেন বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া দূর্গাদাস শবের ঠ্যাং খাইয়াই চলিয়াছেন। দূর্গাদাসের যেন আর অন্যদিকে কোনও হুঁস নাই। এদিকে অধিকক্ষণ হইয়া গেলে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবা রবিদাস ও অন্যান্যদের বলিলেন—"যাও; এবার তোমরা দূর্গাদাসকে ওখান থেকে নিয়ে আস। বলো, গুরুদেব ডাকিতেছেন।"

সকলে মিলিয়া দূর্গাদাসবাবাকে গিয়া বলিতেই দূর্গাদাসবাবা মরার ঠ্যাংটি ছাড়িয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আসিলেন। সকলেই দূর্গাদাসকে লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার মধ্যে কোনও বিকার ভাবনা নাই। শান্ত, বিনীত ভাবে শ্রীগুরুর সম্মুখে আসিয়া দূর্গাদাস বলিলেন—"বাবা, আমায় স্মরণ করিয়াছেন?"

শ্রীশ্রীলোচনদাস—"হ্যাঁ, তুমি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছ দূর্গাদাস। আর এখানে থাকার প্রয়োজন বোধ করি না। চলো, এবার আশ্রমে ফেরা যাক।"

সকলে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সচক্ষে ঐরকম দৃশ্য দেখিয়া রবিদাস নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। তবুও মনের মধ্যে সংশয় আসিতে লাগিল। তাই রবিদাস তাহার মানসিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিতেই লাগিলেন যে এও কি সম্ভব হয়। এতো অসম্ভব। তিনি মনে ভাবিলেন যে ঐ বিষয়ে দূর্গাদাস বাবাকে গিয়া তিনি নিজে জিজ্ঞাসা করিবেন। নয়তো তাহার মন শান্ত হইবার নহে।

ঐ দিনই রবিদাস দূর্গাদাসের ঘরে গেলেন। গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ভাই দূর্গাদাস, তুমি যে শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিয়া ওরকম বীভৎস জ্বলন্ত মরার ঠ্যাং খাইতে লাগিলে, তা খাইতে তোমার কেমন লাগিল?"

দূর্গাদাস বলিলেন—"কেমন আর লাগবে? আমার ব্রহ্মগুরু। তিনি কোনও প্রকারেই আমার অপকারের জন্যে কিছু করিতে বলিবেন না। তাঁর প্রতি আমার সে আস্থা আছে। যিনি সদ্‌গুরু হন তিনি শিষ্যের কোনও ক্ষতি হোক, ইহা কখনই চাহিবেন না। তাই শ্রীশ্রীবাবার আদেশ হওয়া মাত্র কর্মে রত হইলাম। দেখ রবিদাস, তোমরা বলছ মরার ঠ্যাং, কিন্তু আমি যখন খাইতে ছিলাম, তখন আমার মনে হইল যে আমি অপূর্ব স্বাদের মিছ্‌রীর দানা সব চিবাইতেছি। তাই আরও খাবার ইচ্ছা হইতেছিল।"

দূর্গাদাসের কথা শুনিয়া রবিদাস বুঝিলেন যে দূর্গাদাস বাবা তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিসে। ধন্য দূর্গাদাসবাবা সদ্‌গুরুর প্রতি তোমার হৃদয়ের আত্মসমর্পণ। তোমার গুরুভক্তির কাছে আজ আমাদের নতশির হইয়া আসিল। জয়গুরু আমাদের কৃপা করুন যেন আমরা দূর্গাদাসের মত আপনার দাস হইতে পারি।"

ইহার পর রবিদাস দূর্গাদাসবাবাকে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা করিতেন। পরবর্তীকালে রবিদাসও অতি উন্নতমানের সিদ্ধপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন।

তারাপীঠের লাহিড়ীবাবা

আমাদের জন্মভূমি এ ভারতবর্ষ। প্রাচীনকাল হইতেই বহু সাধক-সাধিকা, জ্ঞানী ভক্ত ও ঋষিকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা ১৩২১ সনের ১৯শে চৈত্র শুক্রবার (Good Friday) এক অমৃতময় শুভ মুহূর্তে জ্ঞানসিদ্ধ যোগীরাজ শ্রীহীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এঁনার পিতৃদেবের নাম শ্রীনরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও মাতার নাম শ্রীমতী সুনীতা দেবী। ইহাদের আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলা। বহু ধনী জমিদার বংশের অন্যতম সুব্রাহ্মণ জমিদার বংশে লাহিড়ী বাবা অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাজঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও তিনি নিস্পৃহ ছিলেন। অতি নিষ্ঠাবান সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি সকলকে আপন করিয়া উচ্চ নীচ মানবগোষ্ঠীকে তিনি ভেদরহিত দৃষ্টিতে দেখিতেন।

সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব হংসবাবা অবধূত মহারাজ তাঁহাকে গৃহী করিবার নিমিত্ত নাটোরের মহারাজের ভাগ্নীর সহিত তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। যুবক বয়সেই ইনি এক অত্যাশ্চর্য্য বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মজিজ্ঞাসু হন। এই কারণে বিবাহের বন্ধন তাঁহাকে সংসারাবদ্ধ জীব করিতে পারে নাই। আত্মজ্ঞান লাভেই যে জীবের পূর্ণমুক্তি হয়, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। যুবক বয়সে লাহিড়ী বাবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ করিবার সুযোগ পান। কবিগুরুর ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার মনে আত্মচিন্তার অনুরণন তুলিত এমন কথাও তিনি বলিতেন। শ্রীলাহিড়ীবাবার দীক্ষাগুরু তিনজন। জ্যোতি সম্রাট বাবা হংস অবধূত (জসিডি), শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (মৌনীবাবা) কাছাড়, এবং যোগশিক্ষাগুরু বাবা শান্তারাম

অবধূত(বৃন্দাবন)। পরবর্তীকালে অঘোর সম্প্রদায়ের যোগীরাজ বাবা রামনাথ অঘোরী তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেন।

ইনি কালীঘাটের ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানে বহুকাল সাধন ভজন করিয়াছেন। শ্মশানে অবস্থান করা কালীন তাঁহার নিকট বহু ভক্তের সমাবেশ হইত। পরবর্তীকালে নারু হালদারের শিবমন্দিরে বসিয়া ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে শোনাইতেন। তখন ১৯৬৫ সন; সমকালীন সমাজের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যুবক শক্তিই হইল বাসুদেব শক্তি। তাই তিনি বলিতেন যে যুবকদের ধর্ম সম্বন্ধে অগ্রসর হওয়া দরকার। আত্মজ্ঞানলাভ করা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও চরিত্র গঠন এবং কঠোর সত্যকে উপলব্ধি করা যুবক বয়সেই সম্ভব। বার্দ্ধক্যে ইহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীবের সাক্ষাৎ ইষ্ট হইল মাতা-পিতা। যাঁহারা পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে না তাহাদের সকল কর্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিতেন "তোমরা কঠিন এবং কঠোর সত্যকে গ্রহণ করো। তোমাদের অন্তরে যে বিবেকগুরু আছেন, তিনিই তোমাদের আসল গুরু। আমার কাজ এতটুকুই যে তোমার অন্তরগুরুকে দেখাইয়া দেওয়া।" শ্রীলাহিড়ীবাবা জাতিভেদ সব মানিতেন না। তিনি বলিতেন, "শিষ্য ও গুরু যদি বন্ধুর মত না হয় তবে শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে কারণ, শিষ্য গুরুর নিকট সহজ হইতে পারে না। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে কী ভাবে পথ দেখাইবে? মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধার জাগরণের নামই পূজা; বাহ্য নৈবেদ্য সাজাইয়া বহু অর্থব্যয়ে কর্মকাণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণদের উদরপূর্ণ করা যায় কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌছানো অসম্ভব।" এইরূপ কঠোর সত্যবাদী হওয়ার দরুন একদা ধর্মব্যবসায়ীদের জ্বালায় লাহিড়ী মহাশয়কে কালীঘাট হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল।

তারপর প্রায় দীর্ঘকাল তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে ১৯৬৮ সনে মহান সাধক বামাক্ষ্যাপা বাবার সেবক শ্রীনগেন্দ্রনাথ

বাগচী মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় তারাপীঠে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের সহিত তাঁহার পারিবারিক সম্পর্ক পূর্ব হইতেই ছিল। ইহা ভিন্ন শ্রীবাগচী মহাশয়ের সহিত শ্রীলাহিড়ীবাবার পূর্ব্বজন্মের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এমন উক্তিও বাগচী মহাশয় করিতেন। তারাপীঠের "রাঙা মা" বলিতেন যে তিনি হইলেন বাক্‌সিদ্ধপুরুষ। শ্রীশ্রীকঙ্কালী বাবা (জগদীশ বাবা) তাঁহাকে বলিতেন চলন্ত শিব। ইহা ভিন্ন ডানকুনির সিদ্ধ ভূতপূর্ব ভৈরবী মায়ের (১৩৯ বৎসর জীবিত ছিলেন) আশীর্বাদও লাহিড়ীবাবা প্রাপ্ত হন।

শ্রীলাহিড়ীবাবা তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বলিতেন, একদিন আসবে যেদিন এই ভারতবর্ষ তথা বাংলার মেরুদণ্ড এই যুবকেরা উঠে দাঁড়াবে এবং নিজ আত্ম বিশ্বাসে রুখে দাঁড়াবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে; মানুষ নিজের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে ভ্রান্ত পথে পথহারা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা লোভ এবং স্বজন পোষণ লইয়া ব্যস্ত। তাই যুবকেরাই পারে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। তোমরা সকলে তোমাদের বিবেকের শরণাপন্ন হও। ঈশ্বরকে জানার জন্য, নিজেকে জানার জন্য কোনও দালালের দরকার পড়ে না; প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি বর্তমান। দেশকে অন্ধকার অজ্ঞানতা হতে প্রবুদ্ধ করতে হলে চাই বিবেক জাগরণ।" তাই তিনি কবিগুরুর একখানি গান প্রায়শঃই গাহিতেন—"ও তোর হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

দেহত্যাগের পূর্বে তিনি তারাপীঠ হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। মানবগোষ্ঠীর প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ—"আমি শাশ্বত সত্য, আমার জন্ম নাই, আমার মৃত্যু নাই, জরা নাই ব্যাধি নাই। আমার দেহান্তের জন্য তোমরা দুঃখ কোরো না। আমি তোমাদের হৃদয়ে বিবেকরূপে সর্বদা বিরাজমান। আমার অনুভবের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে রেখে গেলাম শাস্ত্রের সার কথা।" সেই সার কথা বিপথগামী মানব সমাজকে জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীলাহিড়ী বাবা তাঁহার ভক্তশিষ্য জ্ঞানী সন্তানদের প্রতি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

পাতালসাধুর কথা

শ্রীশ্রীপাতালদেব একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। সাধন ক্রিয়ার জ্ঞান, যোগ, তন্ত্র এবং ভক্তি মার্গ ইত্যাদি সর্ব মার্গের সাধনাতেই তিনি বাল্যকাল হইতে (যাহাকে বলা হয় ধ্রুব যোগ) অখণ্ড ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতঃ, অসীম কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা পূর্ণযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনমার্গে তিনি এক সর্বতোমুখী প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন অথচ এই সংবাদ বহির্জগতের মানবদিগের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। তার কারণ তিনি নিজ জীবনের অধিকাংশ সময়ই গিরিকন্দরের গভীর গহনে সমাহিত থাকিতেন, অথবা গভীর নিশীথে শ্মশানে বা শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে নিভৃতে তপস্যা করিতেন। সেই কারণে বাহিরের জগতের কেহই তাঁহাকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। অবশেষে নবদ্বীপ হাইস্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী মশাই নবদ্বীপ শ্মশান ভূমিতে এক সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকারে চট আবৃত অবস্থায় দৈবাৎ তাঁহাকে আবিষ্কার করেন। তাঁহার অলৌকিক তেজোদীপ্তিতে চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে মনুষ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর তিনি ঐ মহাত্মার ইচ্ছানুযায়ী নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটি গুহা নির্মাণ করাইয়া তাঁহাকে সেথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, সেই গুহার গভীর অন্ধকারেই তিনি তপস্যায় রত থাকিতেন। নিঃশঙ্ক মহাশ্মশানে গোমো পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে ও বৈদ্যবাটির মহাশ্মশানেও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিন্তু সর্বাবস্থাতেই নিজেকে গোপনে রাখিতেন এবং জনসমাজ হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেন

ও থাকিতেন। এই মহাত্মার বয়স কত জানা যায় না বা কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব, ইহাও কাহারও বিদিত নহে কারণ তিনি নিজ মুখে কখনও কিছু বলিতেন না। এই মহামানব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—এ যুগে মানবমন সর্ব বিষয়কেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে আগ্রহী। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীশ্রীপাতালদেব বস্তু বিশ্ব ও চেতনা সত্তা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও সরল গণিতের সহায়তায় Pataldev Principle গ্রন্থে পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি সুবিখ্যাত বহু বৈজ্ঞানিক দ্বারা সমাদৃত হইয়াছে। এই মহাত্মার একজন মানস পুত্র ছিল। তাঁহার নাম ছিল "নিত্যানন্দ" বা নিতাই মুখোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতার বরানগর নিবাসী একজন গৃহী সাধু ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে ইনি জন্মসিদ্ধ, নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীপাতালদেবের দেহত্যাগের পর আবির্ভূত হন। স্থূলদেহে শ্রীশ্রীপাতালসাধুর সঙ্গে এঁনার সাক্ষাৎ না হলেও পাতালসাধুর পরমপূজ্যা শক্তিমাতা পরমাসিদ্ধা দীনতারিণী মা এঁনাকে পাতালসাধুর মানসপুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। এঁনারই শ্রীমুখে শোনা যায় যে শ্রীশ্রীপাতালদেব ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীনরহরি প্রভুর পূর্ণ অবতার।

শ্রীভগবান যখন এই প্রাকৃত বিশ্বভূমিতে অবতীর্ণ হন, তখন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীজনই তাঁহার "স্বরূপ" ও "তটস্থ" লক্ষণ বিচার করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন। বস্তুতঃ, অবতার নাহি কহে—আমি অবতার, মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার। আকৃতিপ্রকৃতি—এই "স্বরূপ" লক্ষণ, কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান—এই "তটস্থ" লক্ষমণ।—চৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীশ্রীপাতালদেবের আকৃতিপ্রকৃতি বা 'স্বরূপ' লক্ষণ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত তনুর বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলিয়া যায়। শ্রীশ্রীপাতালদেবের আচরণ আদি অলৌকিক ছিল, অর্থাৎ দেহধারীদের মধ্যে যাহা একান্ত দুর্লভ। তবে সেই

সকল অসাধারণ অলৌকিক শক্তি তিনি সব সময়েই প্রকাশ করিতেন না। যাঁহারা ভগবানের মতো সত্য সংকল্প ও ত্রিকালজ্ঞ হন, তাঁহাদের আজ্ঞা ভগবাদাজ্ঞার মতো অমোঘ হয়।

মানুষের ইচ্ছানুযায়ী চলন্ত ট্রেন থামানো যায়—এ কথা যদি বলা হয়, তবে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে কেহ কি বিশ্বাস করিবে? তবে শ্রীশ্রীপাতালদেবের বিভিন্ন ভক্তদের মুখে বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার ইচ্ছা মতো ট্রেন থামানোর বহু ঘটনার কথা শোনা যায়। সাধারণ Passenger অথবা Express, এমনকি Mail Train ও, যে ট্রেনেই শ্রীশ্রীপাতাল সাধু ভ্রমণ করুন না কেন সে ট্রেনের গতিবিধি তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবেই—এ কথা তাঁহার ভক্তগণ জানিতেন। তবে লোক দেখানোর জন্যে সব ট্রেনই যে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেন তা নহে, তাঁহার লীলা অনুরোধে বিশেষ প্রয়োজন হইলেই সে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইত। আবার অনেক সময়ে নিজে ট্রেনের যাত্রী না হইয়াও, আশ্রমে নিজ আসনে বসিয়াই কোনও ভক্তশিষ্যের জন্যে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এইরূপ বহু ঘটনা বহু শিষ্যের মুখে শোনা গিয়াছে এবং লোকমুখে traditionally চলিয়া আসিতেছে। এখানে তার দু-একটি মাত্র ঘটনা বিবৃত করিলাম।

ইং ২১শে মার্চ ১৯২৬ সালে একবার শ্রীশ্রীপাতালদেব নবদ্বীপ হইতে গোমো রওনা হইলেন। গোমো যাওয়ার পথে আসানসোলে বম্বে মেলে উঠিলেন। ধানবাদ হইতে ট্রেন ছাড়িবার পরই শ্রীশ্রীপাতালদেব সচকিত হইয়া তাঁহার সঙ্গী শিষ্য শ্রীহংসেশ্বর মুখার্জীকে একবার শুধাইলেন—"বাবা, রাধাশ্যাম বাবা তেঁতুলমারির স্টেশন মাস্টার না?"

হংসবাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শ্রীশ্রীপাতালদেব —"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শ্রীশ্রীপাতালদেব বলিলেন—"তা হলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'রাধাশ্যামদাদা রাধাশ্যামদাদা' বলে চীৎকার করে ডাকো"।

হংসবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে এটি মেল ট্রেন। তেঁতুলমারি স্টেশনে তো ট্রেনটি থামবে না, একেবারে গোমো গিয়ে থামবে।"

শ্রীশ্রীপাতালদেব সেকথা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ, তা হোক না কেন; তুমি খুব জোরে চীৎকার করে ডাকো যাতে শুনতে পায়।" গুরুদেবের (শ্রীশ্রীপাতালদেব) এরূপ কথা যে একেবারেই ছেলেমানুষী হইতেছে, তাহা যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন। একে তা Mail Train থামিবে না ঐ ছোট স্টেশনে; তারপর ইহা হল চলন্ত ট্রেন, এখান হইতে তাকে উদ্দেশ্য করিয়া ডাকা, যাহাতে তিনি শুনিতে পান,—এরূপ কথা নেহাৎ শিশু, অজ্ঞান বা পাগল ব্যক্তি ভিন্ন কেহই বলিবে না। এমন অসম্ভব আদেশ শুনিয়াও হংসবাবু তাহার গুরুদেবের আজ্ঞানুযায়ী "রাধাশ্যাম দাদা" বলিয়া যথাসম্ভব চীৎকার করিয়া জানালার বাহিরে গলা বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিতে ডাকিতে একটু থামিলেই গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, "আঃ, থেমো না, ডাকো, আরও জোরে ডাকো, আরও চীৎকার করে ডাকো—ও যাতে শুনতে পায়।" হংসবাবুও তাঁহার আদেশ মতো রীতিমতো চীৎকার করিয়া রাধাশ্যাম দাদাকে ডাকিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট মাত্র—Mail Train তেঁতুলমারি স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ি পূর্ণ গতিবেগেই চলিতেছে আর হংসবাবুও ডাকিয়া চলিয়াছেন—"রাধাশ্যামদাদা রাধাশ্যামদাদা"। গাড়ী Platform এ প্রবেশ করিল,—এমন সময় একী!!!

হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়া ট্রেন থামিয়া গেল ঠিক Plantform এ; তখনো হংসবাবুর ডাকের বিরাম নাই—'রাধাশ্যামদাদা রাধাশ্যামদাদা'—সহসা Platfrom হইতে উত্তর আসিল—"হ্যাঁ এই যে আমি"—কে একথা বললেন? হংসবাবু দেখিলেন স্বয়ং রাধাশ্যাম দাদাই তো! গুরুদেবের কামরাটি ঠিক যেখানে থামিয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে Platform এর উপর

দণ্ডায়মান রাধাশ্যামদাদাই বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলিতেছেন—"কে ডাকে? হ্যাঁ, এই যে আমি।" হংসবাবু তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব, গুরুদেব যাচ্ছেন এই গাড়ীতে।"

"গুরুদেব!—বলিয়া আনন্দে বিস্ময়ে রাধাশ্যামদাদা এক লাফে কামরায় উঠিয়া আসিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তারপর শ্রীশ্রীপাতালদেব রাধাশ্যামদাদার সঙ্গে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল, সেই মতো কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে গুরুদেব হরিলুট দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। ট্রেনও আবার চলিতে আরম্ভ করিল। হংসবাবুর মনে হইল—"হঠাৎ কলটা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল কি?"

এ সম্বন্ধে পরে রাধাশ্যামদাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া জানা যায় যে উক্ত দিন রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়াছেন, এমন সময়ে তন্দ্রাঘোরে দেখেন কিনা—গুরুদেব তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনটা ভাল লাগিল না। গুরুদেবের দর্শন বহুদিন হয় নাই। কবে গোমো তপোবনে আসিবেন, তাহারও কোনও সংবাদ পান নাই; তাই তন্দ্রাঘোরে গুরুদেবকে ডাকিতে দেখিয়া তাঁহার জন্যে বড়ই মন কেমন করিতে লাগিল। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। গরমে ঘুমও আসিতেছে না, সেই কারণে স্টেশনে Platform এ গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। ঠিক ঐ সময়েই Mailটি pass করিবার কথা। কিন্তু আজ কি জানি কেন Mailটি হঠাৎ Platform এ থামিয়া গেল এবং যেখানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ঠিক তার সামনে গাড়ীতেই রয়েছেন স্বয়ং শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহারই দুর্বোধ্য নির্দ্দেশে তাঁহার সঙ্গী হংসবাবু তাহাকেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চলিয়াছেন। শ্রীরাধাশ্যাম দাদার মুখে ঐ কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীশ্রীপাতালদেব তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বলে রাধাশ্যাম দাদাকে তন্দ্রাঘোরে দর্শন দিয়া আহ্বান করিয়া Station-এ platform এ আনিয়াছেন এবং ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া ইচ্ছামতো engine

বিকল করিয়া দিয়া ট্রেন থামাইয়াছেন। সঙ্গী হংসবাবু অবিরাম চীৎকার করিয়া না ডাকিলে রাধাশ্যামদাদা শুনিতে পাইতেন না বা জানিতে পারিতেন না। এই কারণেই শ্রীশ্রীপাতালদেবের হংসবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত ঐরূপ পাগলের মতো আদেশ—"অবিরাম চীৎকার করে ডেকে যাও।" লোক দেখানোর জন্যে তিনি ট্রেন থামাননি; ভগবৎলীলা অনুরোধে যোগমায়া সৃষ্ট এই অঘটন-ঘটন—ঠিক যেন, "খেলিছ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে।"

শ্রীশ্রীপাতালদেবের ইচ্ছামতো ট্রেন থামানোর আরও একটি সুন্দর ঘটনা শুনিয়াছি। ঘটনা স্থল—ব্যাণ্ডেল স্টেশন। শ্রীশ্রীপাতালদেব মেমারী হইতে নবদ্বীপ আসিতেছেন। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া নবদ্বীপের ট্রেনে উঠিলেন। ভক্তেরা তাহাদের শ্রীগুরুদেবকে First Class এর টিকিট করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং শ্রীশ্রীপাতালদেবকে লইয়া তাঁহার সঙ্গীশিষ্য কাটোয়া Local এর একটি First Class কামরায় উঠিলেন। সেই কামরায় একজন ফিরিঙ্গী সাহেব যাত্রী ছিল। তখন ছিল British আমল। ফিরিঙ্গী সাহেবদের দুর্দান্ত প্রতাপ। সুতরাং একজন ছেঁড়া চট গায়ে দেওয়া সাধু ফকিরকে তারা স্বীয় কামরায় সহ্য করিবে কেন? তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া সেই সাহেব শ্রীশ্রীপাতালদেবকে কামরা হইতে নামাইয়া দিয়াছিল। পাতালদেবও নীরবে নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিয়া Platform-এর এক কোণে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন। এদিকে ট্রেন ছাড়িবার সময় আসিল, গার্ডের Whistle হইল, সবুজ নিশানও উড়িতে লাগিল, কিন্তু ট্রেন চলে না। ড্রাইভার চেষ্টা করিল তবু engine চলিল না। অগত্যা ড্রাইভার গার্ডের নিকট খবর দিল। অবশেষে Station Master এর নিকট খবর পৌঁছিল। Station Master সব অবগত হইয়া প্রয়োজনীয় expert staff দিয়া engine পরীক্ষা করাইলেন এবং তাহা সত্ত্বেও যখন কোনও ফল হইল না, তখন Loco Shade হইতে নূতন engine আনাইয়া ট্রেনে লাগানো হইল। এইবারও গাড়ী চলে না। উদ্ভ্রান্ত বিভ্রান্ত Station Master

মহাশয় বিমূঢ় হইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে ধীর পদক্ষেপে নিজ অফিসের দিকে যাত্রা করিলেন। Platform-এ যাইতে যাইতে হঠাৎ Station Master এর দৃষ্টি আকর্ষিত হইল Platformস্থিত একটি বৃক্ষতলে মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছেন—উনি কে? বহু বিখ্যাত মহাশক্তিশালী সিদ্ধমহাত্মা "পাতালবাবা" না? কয়েক মুহূর্ত মাস্টার মশায় থম্‌কে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন—"হ্যাঁ, ছেঁড়া চট গায়ে তিনিই তো। মাস্টার মশায় পাতাল সাধুকে জানিতেন; তিনি অবগত ছিলেন তাঁহার অসীম শক্তি ও অলৌকিক লীলার কথা। পরমুহূর্তেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া নিজে পায়ের জুতা খুলিয়া পাতালবাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তারপর করজোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন—"সাধুবাবা আপনি এখানে? এখানে একাকী এমনভাবে গাছতলায় কেন? পাতালবাবাও তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রচুর হরিলুঠ দিলেন। তারপর সঙ্গের শিষ্যটির নিকট হইতে মাস্টারমশায় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিবৃতি শুনিয়া লইলেন। গভীর মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া মাস্টারমশায় সঙ্গী শিষ্যটির নিকট হইতে তাহাদের দুজনের টিকিট লইয়া দেখিলেন ও পাতালবাবাকে করজোড়ে বলিলেন— "আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।" তারপর সেই নির্দিষ্ট First Class কামরায় উঠিয়া সেই ফিরিঙ্গী সাহেবকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন ও বলিলেন যে পাতালবাবাকে অপমান করিয়া ট্রেন হইতে নামাইয়া দিবার জন্যে আইনত সেই ফিরিঙ্গীর অপরাধ তো হইয়াছেই, উপরন্তু তাহার এমন একজন শক্তিশালী অসাধারণ মহাপুরুষের প্রতি অসদ্ আচরণের দরুন চরম অপরাধ হইয়াছে যে, যার ফলাফল ভাল হইবে না। সেই মহাপুরুষের ইচ্ছায় যে কোনও অঘটন ঘটিতে পারে যেমন—এই ট্রেনের engine এর হইয়াছে। তারপর মাস্টারমশায় সংক্ষেপে ফিরিঙ্গীকে পাতালসাধুর শক্তির মহিমা বিবৃত করিয়া তাহাকে সাধুর কাছে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিলেন। তারপর ফিরিঙ্গী সাহেব

পাতালবাবাকে কামরায় বসিতে আহ্বান জানাইল। তারপর Station Master engine driverকে পূর্বের Engine-এই ট্রেন চালাইতে বলিলেন। হতচকিত ড্রাইভার তখন engine এ গিয়া কল ঘুরাইতেই Engine চালু হইয়া গেল। এদিকে নূতন engineও আবার চলিল। নূতন engineটিকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিলে পর পুরাতন engine এ ট্রেন আবার চালু হইয়া গেল।

পরমের আহ্বান

বিশ্ব প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য লীলা—সূর্য সুদূরে থাকিয়া পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অনবরত আকর্ষণ করে। পঙ্কের মধ্যে পদ্মের জন্ম হয়; কোন্ পঙ্কের মধ্যে পদ্ম নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সূর্য্য দূরে থাকিয়া কিরণ বিস্তার করিয়া কেবল নিয়ত বলিতেছে, "পদ্ম! তুমি প্রস্ফুটিত হও!" তৎপরে পদ্ম ক্রমে ক্রমে সূর্য্য রশ্মিতে, পঙ্ক এবং জল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া জলের উপরি পত্র বিস্তার করিল, ক্রমশঃ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। তখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে,—তখন কেমন সুন্দর কেমন শোভা! যখন পদ্ম, পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন ছিল, তখন সে পৃথিবীর উপরিস্থিত জল ও বায়ুর বিষয় কিছুই জানিত না; ক্রমে যখন ধীরে ধীরে জল ভেদ করিয়া জলের উপর একটি পত্র বিস্তার করিল, তৎপর একটি মুকুল জন্মিল; পরে সে সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হইল এবং পৃথিবীর উপরিস্থিত সব জানিল। ঠিক এমনই উপায়ে সূর্য্যপ্রতিম হিমালয়ের মহা প্রভাকর ব্যাসপীঠস্থ প্রাণপুরুষ হঠ্‌যোগী শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা সুদূর বাংলাদেশ হইতে "সরোজ"কে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার রাজ্যে লইয়া যান।

বাংলাদেশের হাওড়া জেলাস্থ কোনও এক নির্দিষ্ট গ্রামীণ-শহরে বর্দ্ধিষ্ণু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে সরোজের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন খুব দুরন্ত। বাল্যজীবনের দুরন্তপনার দরুন তাঁহার মাতৃদেবী অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন ছেলেকে শাসন করিয়া বলেন "যদি পরীক্ষায় পাস করতে না পারিস তবে ঘর থেকে বের করে দেব।" স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়া ফেল করিবার ভয়ে অজানার সন্ধানে হাওড়া স্টেশন থেকে মা'কে একটি চিঠি লিখিয়া সরোজ হরিদ্বারের পথে উধাও হইয়া গেলেন। সেখানে

বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্য দিয়া সাধুদের আশ্রয়ে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। বালক বয়স থেকে সাধুসন্তের প্রতি ছিল তাঁর এক অব্যক্ত আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের কারণেই সরোজ হরিদ্বারকে পলায়নের জায়গা হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন। তারপর একদিন অতি আকস্মিক ভাবেই মহাগুরু নাঙ্গাবাবার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে। হঠযোগ সিদ্ধমহাপুরুষ নাঙ্গাবাবা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হিমালয়স্থিত ব্যাসপীঠে লইয়া যান। সেখানেই আরম্ভ হয় সরোজের সাধনার জীবন। পরমেশ্বরের আকর্ষণ যখন কাহারও উপর পতিত হয় তখন তাহার আর কোন ভয় থাকে না—তখন সংসারের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে তাকে আবদ্ধ করিতে পারে।

এরপর সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে শুরু হয় কঠোর জীবনসাধনা। প্রথমে তাঁর উপর অন্যান্য গুরুভাইদের সেবা করার ভার পড়ে। প্রত্যহ সবাই মিলে পাহাড়ী জঙ্গলে ধূনীর এবং রান্নার জন্যে কাঠ্ কুড়োতে যাওয়া, বরফে আবৃত নীল গাইয়ের দুধ সংগ্রহ করা ও সকলের খাদ্য পরিপাক করা। হিমালয়ের উচ্চ শিখর দেশে এক জাতীয় নীলগাই দেখতে পাওয়া যায়। সেই গাই আপনা হতেই দুধ ছেড়ে যায় বরফাবৃত প্রস্তরের উপর। বরফ মিশ্রিত দুধের চাঁই শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে এনে আগুনের তাপে গরম করিয়া দুধ তৈরী করিয়া পানের উপযুক্ত করিয়া সেবন করিতে হয়। আর খাদ্যের মধ্যে ছিল ধূনীর আগুনে সেঁকা আটার রুটি ও ছোলা সিদ্ধ ও গুড়। এই হল পাহাড়ী সাধুদের খাদ্য। সমগ্র দিবস ব্যাপী কর্ম করিতে করিতে কোনও কোনও সময় নাঙ্গাবাবার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িত সরোজ। একবার সে মনে মনে ভাবিতেছে—বুড়োটাকে মাথায় বড় পাথর মেরে মাথা ভেঙে দেবে। ওমনি গুহার ভিতর হতে গম্ভীর শব্দে গুরুবাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"ক্যা রে তুম হম্‌কো পত্থর মারে গা?"—এতে লজ্জিত হলেন সরোজ। প্রকৃত সাধনা প্রাপ্তি না হওয়াতেই তাঁর রাগ। প্রকৃত সাধনা না পেয়ে এক দেড় বৎসর শুধু অন্যদের সেবা করিতে করিতেই কঠোরতায় দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া

গেল। অন্যান্য গুরুভাইয়েরা যে যার গুহামধ্যে ধুনী জ্বালাইয়া সাধনায় রত থাকিত কিন্তু সরোজ তখনও সাধনা পাননি। তাই গুরুবাবার উপর এত ক্রোধ হইত। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও কী যেন এক অজানা অচেনা আকর্ষণ তাঁকে ব্যাসপীঠ ছাড়িয়ে অন্য কোথাও যাইবার ইচ্ছা মনে জাগায় নাই। অবশেষে একদিন গুরুবাবার ডাক আসিল। তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বলিলেন—"যদি কোনও ব্যক্তি ভগবৎদর্শন বা আত্মদর্শনকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয় এবং কেবল সেজন্যেই সচেষ্ট হয়, তখন ভগবান তাকে তুলাদণ্ডে রীতিমতো তৌল করে নেন, তাকে সব দিক দিয়ে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে দেখেন যে সে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় কিনা; তার জীবনে চলার পথে নিশ্চল খাঁটি কিনা?" "কাজেই সেই ব্যক্তিকে প্রচুর ত্যাগ করিতে হয়, তাকে অতীব কষ্ট করিতেই হয়। ভগবান তাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে দেন। তারপর তার ভগবৎদর্শন বা আত্মদর্শন ঘটে।" এই প্রকার নানান উপদেশ দিয়া গুরুবাবা সরোজকে প্রদান করিলেন সেই প্রাচীন যুগ হইতে ঐতিহ্যসম্পন্ন ধারায় বহমান সেই আদিকালের পবিত্র—"ব্রহ্মবিদ্যা"।

তারপর দিনরাত চলিতে লাগিল সরোজের কঠোর তপস্যা। মাসের পর মাস চলিতে থাকে তাঁহার ধারাবাহিক যোগ সাধনা। ধীরে ধীরে পরমেশ্বর স্বরূপ গুরুবাবার কৃপায় অন্তর্লোক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সরোজের অন্তঃকরণ হইল দিব্য জ্যোতিতে আপ্লুত। তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন—"মনকে পরিষ্কার করতে গেলে তাকে জারক রসে সিঞ্চিত করতে হয়। সৎ ভাবনাই হচ্ছে সেই জারক রস। মনঃসংযোগ করতে হলে আসনে বসে গুরুপ্রদত্ত কর্ম করার পর ভাবনায় ডুবতে হয়"—ভাবতে হবে যে "আমি আসনশুদ্ধ এই জগৎসংসার ছেড়ে উপরে, আরো উপরে উঠে যাচ্ছি—অনেক উপরে তারাদের কাছে। সেখান থেকে নীচে দেখতে পাচ্ছি গঙ্গা-যমুনা, সমগ্র জগৎ চরাচর। আমি তখন সংসারের অনেক উপরে; তখন সংসারের মলিনতা ব্রহ্মবিদ্যা সাধন, গুঢ় তত্ত্বান্বেষণ, মনন ও গভীর

ধ্যান যখন বৎসরান্তে সমাধা হতে চলিয়াছে তখনই নামিয়া আসিল মহাগুরুর কৃপা। একদিন গভীর রাত্রে, তখন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন, সেই সময় হঠাৎ অন্তরাকাশ আলোকিত হইয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ও হঠাৎ মস্তকের একটি বিশেষ স্থানে হইল প্রবল শক্তিপাত। তারপর আর কোনও বোধ নাই। গভীর নিদ্রা থেকে দূর হতে ভেসে আসা মহাগুরুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন তিনি। মহাগুরুর ডাকে সরোজ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। দেখিলেন পরমারাধ্য গুরুবাবা তাহার পাশে বসিয়া আছেন। তাঁকে সস্নেহে আদর করিতেছেন ও বলিতেছেন—"বাবার সম্পত্তির ওপর ছেলের পুরো অধিকার আছে, যদি ছেলে ঐ সম্পত্তি সৎকর্মে ব্যয় করে।"

যোগ সাধনায় গুরুসান্নিধ্য প্রায় চৌদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত করিলেন সরোজ। প্রথম কয়েক বৎসর সাধনারত অবস্থায় কাটিয়া গেল। তারপর ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক চেতনায় একটা বিশেষ অবস্থালাভ করিলেন তিনি। তখন তিনি কুটস্থ (তৃতীয় নয়ন—সে নয়ন খুলে গেলে যোগীরা বিশ্বকে দর্শন করিতে পারেন) দিয়ে নিজের সূক্ষ্মশরীরকে বাহির করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে গিয়াছেন সরোজের নিজের উপলব্ধির কথায়—"কুটস্থ দিয়ে নিজের সূক্ষ্মশরীরকে বার করতে হয়। সূক্ষ্মদেহে বেরিয়েই এদিক ওদিক ছুটতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু ছুটতে নেই। আগে বেরিয়ে স্থিরভাবে চারিদিক দেখে আবার দেহে ফিরে আসতে হয়। দেহ থেকে বেরোনো এবং ঢোকা, এই দুটো সর্বপ্রথমে আয়ত্ত করে নিতে হয়। ঐ ব্যবস্থা আয়ত্তে এলে তখন এদিক ওদিক ঘুরতে পারা যায়। তবে প্রথমেই দেহ ছেড়ে না যাওয়াই ভাল।"

ঐভাবে তপ চলিতে চলিতে একদা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া গেল। তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন—"মনের শক্তিই আসল শক্তি। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভূত বোধশক্তিকেও মানসিক শক্তি দ্বারা জয় করা যায়। উপযুক্ত মানসিক বলের অধিকারী হলে অগ্নিকেও শীতল বলে মনে হয়।" এখন থেকে সরোজ জগৎকে অন্যদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিলেন। তাঁর মনে হইত এই

পার্থিব জগৎটা যেন একটা রং লাগানো বল। কাছ থেকে দেখিতে খুব সুন্দর কিন্তু ওটিকে জড়িয়ে ধরিতে গেলেই হাত বরবাদ হইয়া যাইবে—তখন সেই রং ছাড়ানো খুবই মুস্কিল। মায়ার গণ্ডীকে অতিক্রম করাইয়া গুরুবাবা তাঁকে এনে ফেলিয়াছেন সত্য মহামায়া স্বরূপা যোগমায়ার রাজ্যে। ধীরে ধীরে মন মানবসত্তা থেকে অতিমানব সত্তায় উন্নীত হইয়া গেল। অতিমানব স্তরে পৌঁছনো মাত্রই দেখা গেল যে তাঁর চতুর্দিকে সপ্তগোলক বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে; তারই মধ্যে একটা গোলকে সরোজ স্বয়ং বিরাজিত আছেন। সপ্তগোলক থেকে অপূর্ব রং বেরিয়ে আসিতেছে। তখন তাঁর মনে হইল যে সেই রং যদি পৃথিবীতে আনা যাইত!!! মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানব দেহ লাভ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করার জন্যে নয়। ঐভাবে মনমধ্যে প্রশ্ন জাগে—"আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? ঈশ্বর তুমি কোথায়?"—ঈশ্বর উত্তর দিলেন—"এই তো আমি এখানে; তোমার সামনেই আছি; আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না! কিন্তু আমি তো তোমার সামনেই আছি। তোমার চোখে ধুলো ভাল করে পরিষ্কার করে নাও। দেখ, আমি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।" অতিমানস সত্তায় পৌঁছে দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হইয়া আসিল। দূরে কোনও পিপীলিকার পেটের ডিমটাও অতি স্পষ্ট দেখা গেল। প্রত্যেকটি ধূলিকণারও যে অসীম শক্তি আছে, তাও উপলব্ধি হইল। প্রত্যেকটি পদার্থে ঈশ্বরের শক্তি রহিয়াছে, ঈশ্বর যে সর্বত্র বিরাজমান তাহাও উপলব্ধি হইল। তখন গুরুবাবা একদা তাঁকে পরীক্ষা করিলেন। সরোজকে ডাকিয়া গুরুবাবা বলিলেন—"তুমি আজকাল অনেক দেখছো। এত দেখা ঠিক নয়। আমি এই মুহূর্তে তোমার চোখদুটি অন্ধ করে স্থূল দৃষ্টিকে হরণ করে নিলাম।"

নাঙ্গাবাবা এই কথা বলা মাত্রই সরোজের চোখে অন্ধকার দর্শন হতে লাগল। তখন গুরুবাবা আবার বললেন—"কি? এবার তুমি সব দেখতে পাচ্ছ?"

সরোজ উত্তর করলেন—"হ্যাঁ"।

গুরুবাবা—"বলতো আমার কটা আঙুল?" (সরোজের প্রতি দুই অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইলেন)।

সরোজ সঠিক উত্তর দিলেন। যতবার প্রশ্ন করা ততবারই সরোজ সঠিক উত্তর দিলেন। তারপর গুরুবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্য কী তুমি সবই দেখতে পাচ্ছ?"

সরোজ—"হ্যাঁ"।

গুরুবাবা—"কি করে দেখছ?"

সরোজ—"কেন? তোমার ঐ দুটো চোখ দিয়ে। আমার চোখ অন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে তোমার চোখ তো অন্ধ হয় নি, বাবা, তোমার চোখ আর আমার চোখ যে একই ও অভিন্ন।"

আনন্দে শ্রীগুরুবাবা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। সরোজ দেখিলেন গুরুবাবার চোখে জল। কিন্তু, ঐ দিন গুরুবাবার চোখে জল কেন তাহা সরোজ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁর উপর ব্যাসপীঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আদেশ হইল। মহাপরিক্রমায় বাহির হইবেন তিনি। বাহির হইবার পূর্বে নাঙ্গাবাবা পবিত্র যজ্ঞ করিয়া, বিরজা হোম করিয়া ত্রিশূল দণ্ড দান করিলেন তাঁহাকে। তখন থেকে তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় দণ্ডীস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস (গিরি)।

মহাপরিক্রমা

নবীন সন্ন্যাসী দণ্ডী স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুবাবার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমগ্র ভারত পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। সুদীর্ঘকাল (প্রায় ১৮ বৎসর) হিমালয় পর্বতের গুহার মধ্যে তিনি কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করিবার পর হঠ্‌যোগে পরিপূর্ণ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া পরিব্রাজনায় যাইবার পূর্বে ব্যাসপীঠের প্রাণপুরুষ মহাগুরু নাঙ্গাবাবা একদিন তাহাকে বলিলেন—"বেটা, আজ তু পরমহংস বন্ গয়া। অব তেরা নাম 'সচ্চিদানন্দ্' হৈ"। এই আশীর্বাদ করিয়া নাঙ্গাবাবা তাঁহাকে শক্তিশালী ত্রিশূল দণ্ড হস্তে দিয়া সমগ্র ভারত পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করাইলেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়া ফেল করিবার ভয়ে সচ্চিদানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন ইং ১৯৫০ সাল। হরিদ্বারে একটি সাধুর সান্নিধ্যে আশ্রয় মিলিয়া যায়। ঐখানেই অলৌকিক ভাবে তাঁহার সহিত পরমপূজ্যপাদ শ্রীনাঙ্গাবাবার দর্শনলাভ হয়। হরিদ্বার হইতেই নাঙ্গাবাবা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া "ব্যাসপীঠে", হিমালয়ের গিরিকন্দরে একটি গোপন মহান তীর্থস্থানে, নাঙ্গাবাবার আশ্রমে লইয়া যান। সেই সময় হইতেই তাহার পবিত্র জীবনের ধারা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। তপরত কিশোর সচ্চিদানন্দ হিমালয়ের নিভৃত গুহায় বসিয়া ভাবিতেন ছেলেবেলায় অনেক সময় সন্ধ্যা-রাত্রিতে তাহার মাতৃদেবী তাহাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড় করাইয়া আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি দেখাইয়া বলিতেন—"সাধু হবি তো ঐ উজ্জ্বল তারার মতো হবি। যেন তোর জ্যোতি সুনীল আকাশে অক্ষয় হয়ে থাকে।" মায়ের কথাই ছিল তাহার বেদবাক্য। সেই কথাই অন্তরে ধারণ করিয়া আজ তিনি সচ্চিদানন্দ পরমহংস হইয়াছেন।

ভারত পরিক্রমা কালে পরিব্রাজনার সময় পথে চলিতে চলিতে একবার গুজরাটের জঙ্গলে পার্বত্য অঞ্চলে তিনি পথ হারাইয়া ছিলেন। তখন সেই অঞ্চল নিবিড় বনাঞ্চল ছিল। সিংহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি আরও নানা জাতীয় জীবজন্তুতে জঙ্গল পরিপূর্ণ থাকিত। পথ চলিতে চলিতে তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ঘন অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। সচ্চিদানন্দ তখন একটি বিশাল বৃক্ষের নীচে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই রকম পরিবেশে প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা। সুতরাং প্রাণের মায়া একপ্রকার ত্যাগ করিয়াই শুধুমাত্র গুরু ভরসায় তিনি টিকিয়া আছেন। সময় যখন ক্রমশঃ রাত্রির প্রতি অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন হঠাৎ সম্মুখে বেশ কিছুদূরে দুটি তীব্র জ্বলন্ত আলো পাশাপাশি দেখিতে পাইলেন। সেই জ্বলন্ত আলো দেখিবামাত্র সচ্চিদানন্দের মনে হইল যে আর রক্ষা নাই; এইবার বুঝি সিংহের ভোজ্য বস্তুতে পরিণত হইবেন। এখন যাহা হইবার তাহাই হইবে। পরম শ্রদ্ধেয় গুরুবাবাকে স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ সেই জ্বলন্ত চক্ষুসম আলোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে বেশ কিছুদূর যাইয়া গাঢ় অন্ধকারেই বেশ বুঝিতে পারিলেন যে উনি একটি পার্বত্য গুহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন এক বৃদ্ধ সাধুবাবা বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র সাধুবাবা বলিলেন যে তিনি ঐ গুহায় থাকিয়া সাধনা করেন এবং নিকটেই যে একজন সাধু পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন ইহা তিনি যোগবলে জানিতে পারেন। তাই তিনি তাঁহার চক্ষু জ্যোতির প্রভাব বিস্তার করিয়া সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই বৃদ্ধ সাধুই গিরনার পাহাড়ের সন্তসুরী। ইনি একজন মহাত্মা ছিলেন। কিছুকাল এঁনার সান্নিধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধ মহাত্মাকে প্রচুর সেবা যত্ন করিয়া, পরে সচ্চিদানন্দ আবার পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গুজরাটেরই জঙ্গলে পরিব্রাজনকালে পথপার্শ্বে আরও একজন মহাত্মার সঙ্গে সচ্চিদানন্দের দেখা হয়।

সেই সাধুবাবার ছিল অতি করুণ অবস্থা। তাহার সমগ্র শরীর কুষ্ঠরোগে পরিপূর্ণ। তিনি একখানেই কোন রকমে বসিয়া থাকেন। কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কোনও পথিক সেই পথ দিয়া গেলে সাধুকে একটু আধটু জল ও খাদ্য সম্মুখে দিয়া চলিয়া যায়। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এঁনার যখন দর্শন হয় তখন তিনি ছিলেন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত এবং তৃষ্ণার জ্বালায় তাঁহার দুর্বল শরীর প্রায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে শীতল জল দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করাইয়া ছিলেন এবং পরে শীতল জল দিয়া সাধুবাবাকে খুব ভালরকম স্নান করাইলে সাধুবাবা বেশ সুস্থ হইলেন। সচ্চিদানন্দকে প্রচুর আশীর্বাদ করিলেন। সাধুবাবা বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজস্ব প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্যেই এমন ভয়াবহ রোগের ভোগ লইয়াছিলেন। এই সাধুবাবার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে সাধুবাবার জন্যে কিছু খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করিবার জন্যে অনুরোধ জানাইয়া সেথা হইতে চলিয়া আসেন। পরবর্তীকালে আর ঐ অঞ্চলে তিনি যান নাই। গুজরাটের জঙ্গলের এই মহাত্মার নিকট হতে যখন সচ্চিদানন্দ প্রস্থান করেন তখন তিনি কোনও দিনও ভাবিতেও পারেন নাই যে এঁনার সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ হইতে পারে। বহুকাল পর বিন্ধ্যাচলে সেই মহাত্মার সঙ্গে আবার দেখা হইল। মহাত্মা সচ্চিদানন্দকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারেন। তিনিও প্রথম দর্শনে পরিচিত বলিয়া বোধ হইলেও, মহাত্মা পুরনো স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিলে পর চিনিতে আর অসুবিধাবোধ হয় নাই। তখন মহাত্মা তাহাকে জানাইলেন যে ভবিষ্যতে কোনও নির্ধারিত সময়ে তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন। সচ্চিদানন্দও মহাত্মাকে বচন দিলেন যে তাহার দেহত্যাগের সময় তিনি সেথায় উপস্থিত থাকিবেন। সেই নির্দিষ্টকাল আগত হইলে সচ্চিদানন্দ আবার সেই গিরনার পর্বতের আখড়ায় গেলেন। গিয়া দেখেন, চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ সুসজ্জিত করিয়া বেদী নির্মাণ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে সেই মহাত্মা আসনে স্থির হইয়া উপবেশিত। দেহত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে চতুর্দ্দিকের

কাষ্ঠগুলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, মহাত্মা দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, বোধহয় জগতের কল্যাণ কামনায়, তারপর মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মহাত্মার দেহাবসান হইল। পারিপার্শ্বের অগ্নি ধীরে ধীরে মহাত্মার দেহটিকে দাহ করিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সচ্চিদানন্দের সেই মুহূর্তে মনে হইয়াছিল, "এই তো প্রকৃত ভগবদ্দর্শন, ভগবান বাহিরে কোথাও নাই, সবই আছে অন্তরে, নিজ দেহভাণ্ডে; এই বোধহয় প্রকৃতপক্ষে মহানের মহাপ্রয়াণ।" ইহা সচ্চিদানন্দের জীবনের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঘটনা। আমি সচ্চিদানন্দ দেবের শ্রীমুখ হতেই এই ঘটনা শ্রুত হই।

দণ্ডীস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংসের ছিল বাঙালী শরীর। সুবিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ছিল তাঁহার জন্ম। ইনি, একজন গুপ্ত মহাযোগী পুরুষ ছিলেন।

ঋষিরা আজও আছেন

মহাতীর্থ কালীঘাট। একদিন সকালবেলা মাতৃদর্শনের জন্যে লোকে লোকারণ্য। সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এক প্রবীণ সাধুবাবার আবির্ভাব হল। ভিড় ঠেলে সাধুবাবা মাতৃদর্শনের জন্যে অগ্রসর হতে পারছেন না, কেউই পথ ছাড়ছে না; তখন হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠে সাধুবাবা বলে উঠলেন—"সম্‌রত্ বাবা রামদাস! সম্‌রত্ বাবা রামদাস! সম্‌রত্ বাবা রামদাস!" হঠাৎ দেখা গেল সম্মুখের ভিড় সরে গেল এবং সাধু অতি অনায়াসে এগিয়ে গিয়ে মাতৃস্বরূপের দর্শন করছেন। তিনি মাতৃদর্শন করে, প্রণাম করে আবার সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এ ঘটনা আজ থেকে প্রায় ৪৫/৪৬ বৎসর পূর্বের ঘটনা। সেই তখন থেকে এই সাধুবাবা কালীঘাটে ঁমায়ের মন্দিরে আজ পর্য্যন্ত সম্‌রত্ বাবা রামদাস বলেই পরিচিত। তাঁর পরণে লাল বসন থাকে। তাই বহুলোক তাঁকে লালবাবা বলেই জানে। ইনি কালীঘাট বা কলকাতার বাসিন্দা নন। গোয়ালিয়র থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ইনি আসেন মহাতীর্থ কালীঘাটে, ঁমাকে দর্শন করতে। বৈষ্ণব শিরোমনি শ্রীশ্রীলোচনদাস বাবাজী মহারাজের অতি প্রিয় বিশিষ্ট শিষ্যবর বর্তমানে এই ১০৯ বৎসর বয়সের বাবা মহেন্দ্র আনন্দ স্বামী নির্মল। এঁনার সাথে আমার বেশ কয়েক বৎসর হল পরিচয়। ইনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ সিদ্ধপুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম দর্শন থেকে যতবারই তাঁকে দেখি, ততবারই মন হয় যেন তাঁর বয়স একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সুদীর্ঘ কাল তার অতি সন্নিকটে থাকার সময় নানা অতিন্দ্রীয় অনুভূতি আমি লাভ করি। তাই তাঁকে দেখে আমার প্রতিমুহূর্তেই মনে হয় যে প্রাচীন ঋষিরা আজও আছেন; নিত্য নব চিরপুরাতন হয়েই আছেন।

সন্তচরণরজ গোয়ালিয়রের লালবাবার জীবনের ভগবৎদর্শনের একটা অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী এখানে তুলে ধরছি।

তখন লালবাবার বয়স অনেক কম। উনি পরিব্রাজনায় আছেন। বদ্রীনাথ ধাম পরিক্রমা করবেন বলে হরিদ্বারে অবস্থান করছেন। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে সে সময়ে বদ্রীনাথ মন্দির পর্য্যন্ত পাকা সড়কের রাস্তা হয়নি। পদব্রজেই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে সাধুসন্ত ও ধর্মাভিলাষী ভক্তের দল বদ্রীনাথে তীর্থ করতে যেতেন। হরিদ্বার তীর্থ প্রত্যেকেই পরিক্রমা সেরে তারপর বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। হরিদ্বারে থাকাকালীন লালবাবার সঙ্গে আরও তিনজন সন্ত জুটে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অতি বৃদ্ধ সন্ত। ওঁনারা চারজন মিলে বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যোশীমঠে এলেন। যোশীমঠে খুব ঠাণ্ডা। সেই প্রবল ঠাণ্ডায় রাত্রে অতিবৃদ্ধ সাধুবাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ সাধুর ভীষণ শ্বাসকষ্ট হতে লাগল, এবং এত অধিক অসুস্থতা পরের দিন হয়ে পড়ল যে আর যেন তিনি বাঁচবেন না, ঐখানেই যেন তাঁর জীবনাবসান হয়ে পড়বে ইত্যাদি। ঐ বৃদ্ধ সাধুর অবস্থা এবং অসুস্থতা পরিদর্শন করে লালবাবার সঙ্গের অন্য দুই সাধু যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো প্রমাদ গুনলেন। ভাবলেন, শুভতীর্থের উদ্দেশ্যে তাদের শুভ যাত্রা যেন অশুভে পরিণত হয়ে না যায়। তাঁদের তীর্থ পরিক্রমায় বাধা পড়ে যাবে যদি অতিবৃদ্ধ সাধুবাবার দেহান্ত হয়ে যায় এবং দেরীও হয়ে যাবে। লালবাবা কিন্তু অন্য সাধুদের মতো মনের ভাব ধারণ করলেন না। তাঁর নিজস্ব সাত্ত্বিক স্বভাববশতঃ নারায়ণ জ্ঞানে বৃদ্ধের সেবা করে চলেছেন। লালবাবার কাছে অনেক প্রকার জরিবুটি সব থাকত। উনি আয়ুর্বেদিক ঔষধপত্রের ব্যাপারেও অনেক কিছু জানতেন। এরই মধ্যে অন্য সাধুরা তাদের দুইজনকে ফেলে বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। লালবাবা আর কি করেন? সমগ্র দিনরাত ধরে ঐ বৃদ্ধ সাধুকে সেবা পরিচর্যা করে সুস্থ করার চেষ্টা করে চলেছেন। দুইদিন প্রবল অসুস্থতা ভোগ করে তারপর আবার বৃদ্ধ সাধুবাবা

চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তখন তাঁকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে তাঁর কোনও অসুখ করেছিল। তিনি বললেন—"আমার শরীর তোমার সেবায় এখন সুস্থ। এবার আমি তোমার সঙ্গেই বদ্রীনাথ তীর্থ পরিক্রমায় যাব।"

তারপরদিন লালবাবা ও বৃদ্ধ সাধুবাবা যোশীমঠ হতে বদ্রীনাথের পথে রওয়ানা হলেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাকালীন বৃদ্ধ সাধুর আর কোনও অসুস্থতা হয়নি। সর্বক্ষণ দুইজনে নানা ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে চলেছেন। অবশেষে বদ্রীনাথের মন্দিরের দরবারে এসে দুইজন দাঁড়ালেন। পূজা দেবার উদ্দেশ্যে সকলকেই লাইনে দাঁড়াতে হয়। দুজনে লাইনে দাঁড়াবেন বলে অগ্রসর হলেন। লাইনে দাঁড়িয়েই পিছনে তাকিয়ে লালবাবা দেখেন যে বৃদ্ধ সাধু নেই। লালবাবা এদিক ওদিক অনেক খুঁজলেন, কিন্তু বৃদ্ধ সাধুবাবার আর দেখা পেলেন না। কোথায় যে তিনি ভ্যানিশ হয়ে গেলেন কে জানে? পরে বাবা বদ্রীনাথজী দর্শন করে পূজা দিলেন। শূন্যমনে লালবাবা ঐ দিন বদ্রীনাথেই রাত্রিটা রয়ে গেলেন। রাত্রে তাঁর নিয়মিত পূজা জপ ধ্যান সেরে যখন বাবা বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন দিব্য জ্যোতির্ময় জ্যোতি নিয়ে বৃদ্ধ সাধুবাবার রূপে ভগবান বদ্রীনাথ তাঁকে স্বয়ং দর্শন দিয়ে বললেন—"ভগবান বদ্রীনাথ তেরা হার্দিক পূজা গ্রহণ কিয়া, অভী তুম বদ্রীনাথ ভগবান কা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্।" লালবাবার সংশয়ের ঘোর ভেঙে গেল। ধন্য ভগবান তোমার লীলা কেবা বোঝে, কেই বা জানে আর কেই বা দেখে? তথাপি সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি আছেন আরার অস্তিত্বের বাইরেও তিনি আছেন। অনুভব করা না করা, তাঁরই কৃপা। ভোর হয়ে এলো। আজ মন প্রাণ যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে লালবাবার। শ্রীবদ্রীনাথ ধাম তীর্থ পরিক্রমা তাঁর সার্থক। প্রসন্ন চিত্তে ঐ দিনই তিনি শ্রীকেদারনাথ তীর্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে একলা যাত্রা করলেন।

স্বরূপে সনাতনী-ব্রহ্মজননী

সেদিনটি ছিল অমানিশার মধ্যরাত্রি। পূজামন্দিরে কক্ষের দরজা রুদ্ধ। ঘরের মধ্যে মাতৃপূজার সকল সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে। এক ভৈরবী তাপসী মাতা মাতৃ-আরাধনায় বসিবেন। আদ্যাশক্তি মায়ের স্বরূপই তাঁহার অভীষ্ট দেবী। শ্রীশ্রীদূর্গামায়ের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসনরতা তাপসিনী প্রথমে অঙ্কিত করিলেন পূজামণ্ডল বা ভদ্রমণ্ডল; এই ভদ্রমণ্ডলেই তাঁকে করিতে হইবে মহাশক্তির উদ্বোধন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল পূজারত ভৈরবী মায়ের স্থির নিশ্চল ধ্যানযোগিনী মূর্তিখানি। সর্বপ্রথমে ধারণায় নিজ মনকে উপনীত করিতে হয় অর্থাৎ ভদ্রমণ্ডলের তাৎপর্য যাহা তাহা মনের দৃঢ় ধারণাশক্তি লইয়া চিন্তা করিতে হয়—যথা— অব্যক্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি ধারণ করিয়া আছেন, ওইই আধার শক্তি। এই যোগমায়ারূপা আদ্যাশক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন। তারপর সেই অনাদি-আদি পরাশক্তি হইতেই "প্রকৃতি"র উদ্ভব হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দৃশ্য—স্থূল থেকে আকাশ মার্গে দৃশ্যমান পদার্থ সমূহাদি। তদুপরি উপবেশিত আছে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু ও কূর্ম্মকে ভর করিয়া আছে অনন্ত; কেহই স্বাধীন নহে। অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছে পৃথিবীর। পৃথিবীর উপরে বা বক্ষে সুধা অম্বুদি বা সমুদ্র; তদুপরি শ্বেতদ্বীপ, তদুপরি রত্নবেদীকা; রত্নবেদীকা উপরি কল্পবৃক্ষ; তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে মণিময় মণ্ডপ। রত্নবেদীকার উপর আছে কল্পবৃক্ষ তদুপরি কেহ কেহ বলেন রত্নসিংহাসন বা স্বর্ণসিংহাসন; তদুপরি অষ্টদল পদ্ম (যাহা ভদ্রমণ্ডলে অঙ্কিত থাকে) বা "বজ্রনখদ্রংষ্টাদি আয়ূধায় মহাসিংহাসনায়"—ধারণা চিন্তা ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিলেই ধ্যান অবস্থা আসিবে। ধ্যানাবস্থার মধ্যে ধ্যান হয়ে আকর্ষিত দেবী তাঁর বাহনোপরি

স্থাপিত হইবেন। নিরাকার পরমব্রহ্ম তিনি অনাদি, অনন্ত, অনির্দেশ্য। দুইটি ধারার রূপ নির্দেশিত দেখা যায় পর ও অপর। পরব্রহ্ম-অপরব্রহ্ম হইতে মায়া বিজড়িত রূপ গ্রহণ করিয়া অগ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া চলেন; তারপর তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া তাঁর লীলা মানস প্রকটিত করেন, তারপর তিনি সাকারে লীলা করিবার ধারা গ্রহণ করেন। এইভাবে প্রথমে তাঁকে সাকার ও আলোকরূপে প্রথম প্রকাশিত হইতে হয়। এই যে আলোকের রূপ তা সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই সূর্য্য আকাশের দৃশ্যমান সূর্য্য নয়, ইনি একচক্র রথে ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমায় নিযুক্ত। তিনিই মহাকাল সৃষ্টি করিয়া সর্বক্ষমতা তাঁকে অর্পণ করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি সর্বশক্তিমান স্বাধীন সত্তা। মহাকাল সৃষ্টিভার, গ্রহণ করিয়া কালকে বিভাগ করিলেন। ইহার দ্বারা যুগ, যুগসন্ধি, বর্ব, অয়ন, মাস, পক্ষ হইতে মুহূর্ত পর্যন্ত এবং তদ্‌পরবর্তী অণুপরমাণু কালকে বিভাগ করিলেন। ইনি স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম-শৃঙ্খলের মাধ্যমে সব কিছু পরিচালনা করিতেছেন। ইহাতে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম নাই। যেমন, সূর্য্য পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিমে অস্ত যায়, দিবাকে ও রাত্রিকে দুই অংশে বিভাজিত অবস্থা আজও বর্তমান; আবার দেখ, ফল দ্বারা ও গাছ দ্বারা ফল নির্দিষ্ট হইতেছে। ইহারও কোনও ব্যতিক্রম নাই। কাল স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে বিভিন্ন লোকের সমাবেশ যথা—গোলক, বৈকুণ্ঠলোক, কৈলাস, দেবলোক বা দ্যুলোক, অম্বুলোক, জল তা হইতে পৃথ্বী। লোক সকল রক্ষার নিমিত্ত লোকপালের প্রয়োজন হইল। এইভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনজন বিভিন্ন লোকের লোকপাল হইলেন ইত্যাদি। পৃথিবীস্থ বস্তু সমূহাদির লোকপাল হিসাবে বর্তমান দৃশ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি ইত্যাদি ইহলোকে লোকপাল হিসাবে নির্ণীত। এঁদের আবাস স্থলের জন্য মহাকালকে প্রার্থনা করায় তিনি জল হইতে হস্তদ্বয় দ্বারা মন্থনপূর্বক যে পদার্থ আনয়ন করেন তাহা হইল অশ্বরূপ। ইহা দর্শন করিয়া লোকপালগণ বলিলেন—এর

ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম নয়। উহা আবাসের অনুপযুক্ত। তখন জলে নিক্ষেপ পূর্বক দ্বিতীয় অশ্ব সৃষ্টি হইল। তখন লোকপালগণ দ্বারা ব্যক্ত করা হইল যে ইনি গো আকৃতি। তাঁহারা বলিলেন এই গো এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য পরিচালনা করিতে পারে; যেমন ঘ্রাণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাভী দর্শন করিতে পারে, অতএব ইহারাও ইন্দ্রিয়গতি সূক্ষ্ম নয়, ইহাও আবাসের অনুপযুক্ত। তারপর উহাও জলে নিক্ষেপের পর জল আলোড়িত পূর্বক আরেকটি আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু তুলিয়া আনা হইল—যাহা মনুষ্য আকৃতি বিশেষ। লোকপালগণ এইবার বলিলেন—ইহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সুতরাং ইহা লোকপালগণের উপযুক্ত আবাস স্থল। এইভাবে চক্ষুস্থানে অগ্নি, চন্দ্র মনোস্থানে, বায়ু প্রাণস্থানে আবাস গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ আবাস স্থল গ্রহণ করিলেন। তাদের খাদ্য বিষয় জানার ইচ্ছা দ্বারা যে যে রূপ দেখা দেয় তাহাই এঁনাদের খাদ্য হইবে। যেমন, চোখের একটি দৃশ্য দৃষ্ট হইল; তাহা মন গ্রহণ করিয়া চিন্তা দ্বারা, বহু কল্পনা দ্বারা রূপদান করিয়া চলিতে লাগিল। রূপদানের মাধ্যমে মনের চিন্তারাশি কল্পনাগুলি স্তূপীকৃত রূপ ধারণ করিল ও তারই মধ্যে মন ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল চিন্তারাশিকে শান্ত করিয়া সাধক গভীর ধ্যানে চিত্তবৃত্তি নিরোধকরতঃ আত্মস্থ হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নিত্য হইতে লীলায় আবার লীলা হইতে নিত্যে যাওয়াই আদ্যাশক্তি মহামায়া মায়ের বিচিত্র খেলা।

জ্ঞানের প্রদীপ হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে ধ্যান সমারত ভৈরবীমাতা পূজায় সমাধি মগ্ন হইলেন। কয়েক দণ্ড পর তাঁহার আবার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন নিজ আসনে উপবেশিত অবস্থায় স্থির নিশ্চল ভাবগম্ভীর আঁখি উন্মীলিত করিয়া তাপসিনী দেখিলেন সম্মুখে তখনও অখণ্ড প্রদীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সেই প্রদীপের আলোর সামনে প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত মাতৃবিগ্রহ যেন সোনার বরণ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে কক্ষের সকল বস্তুর প্রতি তাপসিনীর লক্ষ্য পড়িল। তিনি দেখিলেন ঘরের

সমস্ত বস্তুই স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে। এরপর গভীর সমাধি অবস্থায় অন্তঃস্থিত মহাজ্ঞান তাপসীমাতার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় ভাববিভোরা মাতা আদ্যাশক্তির অখণ্ডতত্ত্ব বিষয় বলিতে লাগিলেন—"সূর্য্য ও সূর্য্যের আলো যেমন অভিন্ন, তেমনই ব্রহ্ম বা চৈতন্য ও শক্তি অভেদতত্ত্ব। সূর্য্য যেমন সূর্য্যের আলোক বিনা প্রকাশিত হইতে পারে না, তেমনি সূর্য্যালোক আধাররূপ সূর্য্যকে আশ্রয় বিনা প্রকাশিত হইতে পারে না। এই ব্রহ্ম বা চৈতন্যের প্রকাশ শক্তিই হইল আদিশক্তি পরমব্রহ্ম স্বরূপিনী; ইনি স্বরূপে সনাতনী, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মহাকর্ত্রীরূপা ব্রহ্মজননী আদ্যাশক্তি "মা"। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায়—"ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন"—এই রূপের সাগরই হল মায়ের অমৃতের সাগর। যে সাগরে সাধকের মন নিমগ্ন হইলে অমৃতের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান মেলে। এই রূপের সাগরই চৈতন্যময় অণুপরমাণুর সুবিস্তৃত অসীম সাগর। সেই অখণ্ড জ্যোতির্ময় অণুপরমাণু সমুদ্রেই অখণ্ডজ্যোতিরূপা বিরাট "অখণ্ডমা"য়ের প্রকাশ হয়। এই আদিশক্তিরূপা "অখণ্ড মা" হইতে শব্দব্রহ্মের আবির্ভাব। শব্দ ব্রহ্ম মহানাদ থেকে ওঁকারের উদ্ভব হল। ওঁকারের ব্যাখ্যা হল—অকার, উকার, মকার—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। মায়ের নিত্য অবস্থা থেকে নিত্য স্থিত মহাপ্রকাশময় মহাকারণ জগৎপ্রকটিত হল। মহাকারণ চেতনা তুরীয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সেই নিত্য থেকেই মায়ের লীলা আরম্ভ হল; মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ সমুদ্ভূত হল। তখন মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল। সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয় হল অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয় হয়ে যায়— নিত্য হতে লীলা আবার লীলা হতে নিত্যে—অর্থাৎ নিত্য হতে কালে আবার কাল সংকুচিত হয়ে নিত্যে লয়প্রাপ্ত হয়ে কালাতীত অবস্থায় মহাপ্রকাশের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এখানে অনন্ত সৃষ্টি রয়েছে। এইই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মজননীর স্বপ্রকাশ

নির্বিকার লীলা। যখন এই আদ্যামহাশক্তি লীলাসংবরণকরতঃ নিষ্ক্রিয় অবস্থাপ্রাপ্ত হন তখনই তিনি হলেন, "পরমশিব"। তাই শিব ও শক্তি অভেদতত্ত্ব। সৃষ্টি মধ্যে "মা" ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। আদিতেও মা, মধ্যেও মা এবং অন্তেও মা। মহাশক্তি "মা"ই পুংভাব ও স্ত্রীভাব ধারণকরতঃ সৃষ্টি মধ্যে লীলা করিয়া থাকেন। তাই সমগ্র সৃষ্টি জুড়িয়াই চৈতন্য শক্তির খেলা চলিয়াছে।"

দর্পচূর্ণ

বিশ্বকল্যাণার্থ মহাপরিক্রমা করিবার সময় শ্রীনানকদেব একবার কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। অনন্তনাগের আশেপাশের স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীগুরুনানকদেব ঋষি মার্তণ্ডের যুগল ঝরণার স্থলে আসিয়া পৌঁছাইলেন। জন্মজাত প্রকৃতি প্রেমিক শ্রীনানকদেব ঐ স্থানের রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া সেইখানে মত্তন নামক স্থলে তাঁহার সিদ্ধাসন পাতিলেন। সেই স্থলটি দুটি ঝরণার মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং নিম্নে অপূর্ব মনোরম একটি ঝিলের কিনারে ছিল। সেই স্থানটি চারিদিকের প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ছিল। বিশ্বপ্রকৃতির নানারূপের নানা বর্ণের প্রাচুর্য যেন তথায় উপচিয়া পড়িতেছে। সেই অনাবিল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া শান্ত স্নিগ্ধভাবে প্রকৃতিদেবীর কোলে শ্রীনানকদেব পরমাত্মার চিন্তনে পরিপূর্ণ নিমগ্ন হইয়া গেলেন। বেশ কিছুদিন এই স্বর্গীয় পরিবেশে থাকিয়া পরমাত্মার নিত্য সান্নিধ্যলাভ করিয়া তিনি জীবন, প্রকাশ, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম তথা আনন্দের মধ্যে যে অমৃত পান করিয়াছিলেন তাহার রস তিনি সেইস্থানের অন্যান্য মানুষের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেইখানের সাধারণ মানুষেরা অতি অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল যে শ্রীগুরুনানকদেব একজন মহাত্মা ও অসাধারণ পুরুষ। ক্রমে শ্রীগুরুনানকদেবের খ্যাতি সমগ্র কাশ্মীরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ওই সময় ব্রহ্মদাস নামে পরম বিদ্বান এক ব্রাহ্মণ লোকমুখে শ্রীগুরুনানকদেবের কথা শুনিতে পাইলেন। ব্রহ্মদাসজী কাশ্মীরের একজন অতি পণ্ডিত বিদ্বান মানুষের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে যথায় তিনি গমন করিতেন তথায় দুই উট বোঝাই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি সকল তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। সেকালে

ব্রহ্মদাসজী বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রতর্কে পরাজিত করিয়া বিদ্বৎ সমাজের উচ্চস্থান করিয়া লইয়া ছিলেন। ব্রহ্মদাসজীর গলায় সদাসর্বদা তাহার উপাস্য দেবতার পাথরের মূর্তিখানি সুতলীতে বাঁধা ঝুলানো থাকিত। চাল চলনে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া তিনি চলিতেন ও তাহাকে দেখিলে প্রভাবশালী বলিয়াই মনে হইত। সেই মহাপণ্ডিত ব্রহ্মদাস লোকমুখে শ্রীগুরুনানকদেবের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি এও শুনিয়াছিলেন যে শ্রীগুরু নানকদেব সদা চামড়ার বালাপোষ পরিধান করেন এবং মাংস ভোজন করেন। তিনি আরও শুনিয়াছিলেন যে একজন মেষ পালক ঐ বিচিত্র বেশভূষাধারী মানুষটির প্রতি হাসি-তামাসা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্বে মেষ পালকটি এতই প্রভাবিত হইয়া পড়ে যে শ্রীগুরুনানকদেবের শ্রীচরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অবশেষে মেষপালকটি ঐ আশ্চর্য্য মানুষ শ্রীনানকদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শ্রীনানকদেবের চরণের স্পর্শে মেষপালকের জীবনের আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মদাসজীর অন্তঃকরণ শ্রীনানকদেবকে দর্শন করিবার জন্যে উৎসুক হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহার বিদ্যার অহংকার এতই প্রবল ছিল যে শ্রীগুরুনানকের সান্নিধ্যে যাইবার সংকল্প তিনি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমি নিজে শ্রীগুরুনানকের নিকট গেলে আমার প্রতিষ্ঠায় চিড় খেয়ে যাবে।"

ব্রহ্মদাসজীর মনে যখন এ সকল বিষয়ে তোলপাড় চলিতেছে তখন এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় একদিন কামাল নামে তাহার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কামাল ভিন্ন জাতি হইলেও পরমাত্মার বিষয়ে সাচ্চা জিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি জনশূন্য জঙ্গলে, পাহাড়ে, উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। সেই কারণে বেশীরভাগ সময়ই কামালের হৃদয় অতৃপ্ততায় পরিপূর্ণ থাকিত। তাহার মিত্র ব্রহ্মদাসের সমগ্র বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যও তাহাকে সন্তোষ প্রদান করিতে পারে নাই। সুতরাং কামালের

আত্মা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মদাসের সহিত কামালের সাক্ষাৎ হওয়ায় কামাল শ্রীগুরুনানকদেবের সম্পর্কে সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। ঐদিন কামালের অন্তরাত্মা তাহাকে নির্দেশ করিল, "তুমি যাও, ঐ অচেনা মানুষটিকে দর্শন করো। এতদিন অতৃপ্ত হৃদয়ে যে পরমবস্তুর জন্যে তুমি অস্থির হয়ে মরছো, হতে পারে সেই অমৃতের প্রাপ্তি সেই অচেনা মানুষ দ্বারাই ঘটিবে।"

কামাল নিজ অন্তরাত্মার নির্দেশ স্বীকার করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীনানকদেবে নিকট গমন করিলেন। শ্রীগুরুনানকদেবের দর্শন মাত্রই তাহার জীবনের কায়াকল্প হইয়া গেল। যে বস্তুলাভের জন্য অনেক দিন কঠোর উগ্র তপস্যা তাহাকে করিতে হইয়াছিল, তথাপিও তিনি উহা লাভ করিতে পারেন নাই, সেই পরমবস্তু লাভ শ্রীগুরুনানকদেবকে দর্শন মাত্রই তাহার হইয়া গেল। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ্ হইয়া কামাল শ্রীনানকদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিবামাত্রই আনন্দের অদ্বিতীয় লহরী তাহার সমগ্র শরীরে খেলিয়া গেল। তাহার প্রসুপ্ত অন্তরাত্মা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। তিনি নিজের অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার পবিত্র অখণ্ড জ্যোতির দর্শন পাইলেন। শ্রীনানকদেবকে দেখিয়া তাহার অনুভব হইল "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"। পরমাত্মার রাজাধিরাজের রূপ তাহার হৃদ্‌সিংহাসনে বিরাজমান আছে, কিন্তু অজ্ঞানতা আর ভ্রমের কারণে উহার খোঁজ বাহিরেই করা হইতেছিল। কামাল শ্রীনানকদেবের পর্য্যটনের সাথী হইয়া গেলেন। ততদিন তিনি সাথী ছিলেন যতদিন না শ্রীনানকদেব তাহাকে আদেশ দিলেন যে "তুমি পরমাত্মার নির্দেশিত আমার সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করো।"

যখন ব্রহ্মদাসজী তাহার মিত্র কামালের পরিবর্তনের কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি শ্রীনানকদেবের কাছে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার বিদ্যার অহংকারও তাহার সাথে সাথে চলিল। তিনি শ্রীনানকদেবের সঙ্গে শাস্ত্রার্থে আরও তর্কবিতর্ক করিতে চাহিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মদাস

শ্রীনানকদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনি চামড়ার বালাপোষ কেন পরিধান করেন এবং কেনই বা আপনি মাংস ভোজন করেন?"

শ্রীগুরুনানকদেব হাসিয়া জবাব দিলেন, "পণ্ডিতজী মহারাজ, বস্ত্রবিশেষ পরিধানের ক্ষেত্রে অথবা ভোজন বিশেষ করিবার জন্যে তো আর পবিত্রতা হয় না। সাচ্চা পবিত্রতা মানুষের অন্তঃকরণের মধ্যে থাকে। সেই পবিত্রতাই মানুষের চরিত্রের সংস্কার সাধন করে এবং তৎসঙ্গে অন্য মানুষের সহিত উচ্চ ব্যবহার ও সমানতা বোধ এনে দেয়। তেমন খাদ্য ও বস্ত্র পরিত্যাগ করা চাই যার দ্বারা উত্তেজনা আর রোগ উৎপন্ন হয়। তৎসঙ্গে ভাবনা, ইচ্ছা, আর বিচারকে কলুষিত না করাই মঙ্গল। ভোজন ও বস্ত্রের অনাবশ্যক ঔপচারিকতা পালনে, মানুষের হৃদয় আর শরীর সংকুচিত এবং সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইহা হতে অন্তঃকরণে স্থিত পরমাত্মার অখণ্ডজ্যোতির উপর ছাই চাপা পড়ে যায়। তুমি যতোধিক গ্রন্থের অধ্যয়ন জ্ঞানের নিমিত্ত করেছ, ততোধিক তোমার হৃদয়গ্রন্থি আরও দৃঢ় হয়ে পড়েছে। পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানে এখনও তুমি আনাড়ী আছো। তোমার অধ্যয়ন রূপ বোঝার ভার নিজের আত্মার উপর আরও অধিক পড়েছে, সেই কারণে জ্ঞানের সূক্ষ্মতা প্রাপ্তির পরিবর্তে তার স্থূলতাই বর্দ্ধিত হয়েছে; সাচ্চা জ্ঞান মানুষের জীবন যাত্রায় সহায়ক সিদ্ধ হয় আর তা হতেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। দৃঢ় বিশ্বাসই হল সাচ্চা জ্ঞানের মূল; প্রেমের বিবিধ রূপ তার শাখা-প্রশাখা মাত্র। তোমার শুষ্ক হৃদয়ে বিশ্বাস আর প্রেমের অভাব আছে। অতএব আপনি কি করে পরমাত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হবেন? ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। যাঁর হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম বিদ্যমান, তাঁর হৃদয়েই পরমাত্মার নিবাস। এরূপ স্থিতিতে জীবাত্মা আর পরমাত্মার কোনও ভেদাভেদ থাকে না।"

শ্রীগুরুনানকদেবের কথায় ব্রহ্মদাসের হুঁস হইল। তিনি তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার দার্শনিক মন শ্রীনানকদেবকে আরও

প্রশ্ন করিতে বাধ্য করিল। অতএব তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "সৃষ্টি নির্মাণ কি প্রকারে হল? সৃষ্টির প্রারম্ভে কোন তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল? সেই সময় সৃষ্টি নির্মাতা পরমাত্মা কোথায় ছিলেন?"—

শ্রীগুরুনানকদেব ব্রহ্মদাসকে বলিতে লাগিলেন—"সে কোন্ বেলা ছিল, কোন্ সময় ছিল, কোন্ তিথি ছিল, কোন্ বার ছিল, কোন্ ঋতু ছিল, কোন্ মাস ছিল, যে সময় সৃষ্টি রচনা হয়েছিল? পণ্ডিতদের সৃষ্টি রচনার সময় জ্ঞাত নয়, কারণ যদি তাহারা জানতেন তবে পুরাণে তার উল্লেখ অবশ্য করতেন। কাজীগণেরও সৃষ্টিরচনার সময় জানা নাই, কারণ যদি তাহারা জানতেন, তো কোরাণে সেই বিষয়ে অবশ্য উল্লেখ করতেন। সৃষ্টি রচনার তিথি আর বার যোগীগণও জানেন না। কেহই সৃষ্টি রচনার ঋতু বা মাস জানে না। যে কর্তা সৃষ্টিকে সাজিয়েছেন একমাত্র তিনিই এই রহস্যকে জানতে পারেন।"

শ্রীনানকদেব আরও বলিলেন—"এতটাই জানা পর্য্যাপ্ত যে সমস্ত সৃষ্টি পরমাত্মার দ্বারা রচিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা সৃষ্টির প্রতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশেই বিরাজমান রয়েও তা হতে উপরে। পরমাত্মার স্বরূপ জানতে হলে আমাদের পরমাত্মার সমান হতে হবে। এর জন্যে আমাদের সমগ্র প্রাণীকেই অনন্য প্রেম করতে হবে আর তাদের সেবা করতে হবে এবং অন্যদিকে সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রতি অনন্য ভক্তি আর প্রেম করা উচিত এবং অহর্নিশি তাঁহার চিন্তনে তন্ময় থাকা উচিত। এইসব তো ব্রহ্মদাস কোনদিন করেন নি। অতএব পরমাত্মার স্বরূপ আর তাঁহার মহিমা কি প্রকারে জানতে পারবেন?"

শ্রীনানকদেবের কথা শুনিয়া ব্রহ্মদাস হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি তখনই শ্রদ্ধাভাবে আপ্লুত হইয়া শ্রীনানকদেবের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—"গুরু মহারাজ আমার প্রতি কৃপা করুন। আমায় জ্ঞানের আলো প্রদান করুন।"

শ্রীনানকদেব পণ্ডিত ব্রহ্মদাসজীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত ব্রহ্মদাসের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মদাস শ্রীগুরুনানক-দেবের একজন অনন্য শিষ্যে পরিণত হইলেন।

(শ্রীগুরুনানকের জীবনী গ্রন্থ হইতে সংকলিত।)

জগন্নাথপুরীতে সন্ধ্যা-আরতি

শ্রীগুরুনানকদেব মহাপরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। আসাম, কাছাড়, পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা যাত্রা সমাপন করিয়া গুরুনানকদেব জগন্নাথপুরীতে সমুদ্র যাত্রায় আসিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দির উড়িষ্যায় পুরীতে অবস্থিত। এই পুরীধাম বা শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণু ভগবানের মূর্তিকে শ্রীজগন্নাথ বলা হয়। আমরা জানি যে ইহা হিন্দুদের এক অতি সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রতিবৎসরই লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে আসেন। তখনকার দিনে মূর্তিপূজা লইয়া অতিরিক্ত অন্ধবিশ্বাস মানুষের মনে আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। আষাঢ় মাসে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ যাত্রা হয়। সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ লইয়া খুব বড় রথে শোভা যাত্রা পুরীর রাস্তায় বাহির হইত। শ্রীবিগ্রহকে খুব বড় লোহার রথে স্থাপন করা হইত এবং পুরী নগরীতে বিশাল শোভাযাত্রার সঙ্গে ঐ রথকে সারা শহরে ঘোরানো হইত। সে সময় অন্ধবিশ্বাস আর মূর্খতার এক এমন প্রচলন ছিল যে মানুষ রথের চাকার নীচে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিত এবং রথের চাকা মানুষের দেহের উপর দিয়া চলিয়া যাইত এবং পরিণামে মানুষের মৃত্যু হইত। এই প্রকারে মৃত্যুবরণ করিয়া লোকে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিত এবং তাদের বিশ্বাস এমনই ছিল যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিলে উহারা মনে করিতেন যে তাহাদের গতি বিষ্ণুলোকে হইবে বা তাহাদের সাক্ষাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটিবে। শ্রীনানকদেব এই অন্ধকুসংস্কার হইতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুরীতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথজীর মন্দির হইতে কিছু দূরে গুরুনানকদেব আসন বসাইলেন। তিনি ভাল গান করিতে জানিতেন। কথিত আসনে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁর ভজনামৃত মধুর স্বরে কীর্তন করিতেন। গুরুনানকদেবের নিজকণ্ঠে গাওয়া মধুর সঙ্গীতে এক অলৌকিক আকর্ষণী শক্তি ছিল। ক্রমে অনেক তীর্থযাত্রী আসিয়া গুরুনানকদেবের পাশে বসিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁহার স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। সঙ্গীত সমাপনান্তে শ্রীনানকদেব ধ্যানবস্থিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন দুখানি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া মুদিত রহিল। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ও কৃপালু, সর্বশক্তিমান পরমাত্মা, তুঝে লাখোঁ ধন্যবাদ!" এই বলিয়া প্রণাম করিয়া তিনি নয়ন উন্মীলিত করিলেন। তিনি করুণাযুক্ত হইয়া প্রেমসিক্ত দৃষ্টিতে তাঁহার আশেপাশের লোকজনদের দেখিলেন। তারপর জনসমাবেশে শ্রীনানকদেব সর্বশক্তিমান সর্বনিয়ন্তা সর্বাধার সর্বান্তর্যামিন্ অত্যন্ত কৃপালু পরমাত্মার গুণগান কীর্তন করিলেন। তাঁহার মুখাশ্রিত অমৃত বাণীতে মানুষের মনের ভ্রম, শঙ্কা, দুঃখ, কষ্ট যেন লাঘব হইতে লাগিল। এইভাবে তাহাদের প্রত্যহ নানকদেবের সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের বার্তালাপ চলিতে লাগিল। দিনে দিনে শ্রীনানকদেব যে একজন সিদ্ধপুরুষ তাহা শ্রীক্ষেত্রে প্রচার হইতে লাগিল। সমগ্র জনতা তাঁকে প্রেম ও প্রতিষ্ঠা দিতে লাগিল। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল মানুষের অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তাদের জীবিকানির্বাহ করিতেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। তাহারা তাহাদের শাস্ত্র ও তর্কবিতর্কের বলেই শ্রীনানকদেবকে কাহিল করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরুনানকদেবের অগাধ প্রেম, পূর্ণবিশ্বাস, মহান তর্কবিতর্কের জ্ঞানময় শক্তি, সত্য সহৃদয়তা, নিষ্কপট ব্যবহার কুশলতা ও দূরদর্শিতার সামনে দুষ্ট ব্রাহ্মণদের কোনও দুর্বৃত্তিই কার্য্যকরী হইল না। তখন উহারা গুরুনানকদেবের মহান ও উদাত্ত ব্যক্তিত্বের সামনে হতপ্রভ হইয়া গেল। তাহারা গুরুনানকদেবের মহিমা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধ্যা হইল এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সান্ধ্য-আরতির সময় হইল। মন্দিরের প্রধান পূজারী ও অন্যান্য সকলে শ্রীনানকদেবকে শ্রীজগন্নাথের সন্ধ্যা আরতিতে সম্মিলিত হইবার জন্যে আমন্ত্রণ দিলেন। সহর্ষে শ্রীনানকদেব পূজারীগণের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। দেবাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুনানকদেব দেখিলেন কি একটি অনেক বড় সোনার থানায় একটি বড় প্রদীপ রাখা আছে। ঐ বড় প্রদীপের চারিদিকে ছোট ছোট আরও অনেক প্রদীপ প্রকাশিত হইতে ছিল। ঐগুলি বহুমূল্য মোতি হীরে জহরত খচিত দীপক ছিল। বড় প্রদীপের জন্যে অনেক রূপার ছোট ছোট পাত্রে ভোগ প্রসাদের জন্যে অনেক সামগ্রী রাখা ছিল। কয়েকজন পূজারী শ্রীজগন্নাথদেবকে রূপার চামর দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে আরতির বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছিল। সোনার থালা হস্তে লইয়া পূজারী শ্রীজগন্নাথদেবকে আরতি করিতে ছিলেন। এই সমগ্র কিছুর সঙ্গে স্তবস্তুতি গানও চলিতেছিল। আরতির দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু শ্রীগুরুনানকদেবের মন আরতিতে রইল না। তিনি হঠাৎ আরতি স্থল পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আকাশের তলে মন্দির চত্বরে খোলা যায়গায় চলিয়া আসিলেন এবং তন্ময় হইয়া রহিলেন। তখন তাহার মধ্যে দিব্য অনন্ত আকাশের দর্শন হইতে ছিল এবং তাঁহার শ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মহিমা শক্তির আরতি চলিতেছিল। দিব্য বিভূতির স্পর্শে গুরুনানকদেবের চক্ষু মুদিয়া আসিল। তিনি শান্তভাবে বিরাট পুরুষের বিরাট আরতি করিতে লাগিলেন। অন্তঃস্থিত আরতিতে তন্ময় হইয়া শ্রীনানকদেবের বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা হইয়া গেল। এর মধ্যে শ্রীজগন্নাথের বাহ্য আরতি সমাপ্ত হইল এবং পূজারীগণ দেখিলেন যে শ্রীনানকদেব আরতিতে যোগদান করেননি। ইহাতে পূজারীগণ তাঁহার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাহারা সবাই তাহাদের অসন্তোষ শ্রীনানকদেবকে ব্যক্ত করিলেন। তখন শ্রীনানকদেব তাহাদের বলিলেন, "ভাইয়োঁ, মৈনে অপনি প্রতিজ্ঞা তোড়ী নহীঁ। জগন্নাথজী কী আরতি করনে

সে মৈ তটস্থ নহী রহা। আপনি লোগ জগন্নাথজী কী আরতি মেঁ সম্মিলিত নহীঁ হুয়ে। আপলোগ মেরী আরতি মে ভী নহীঁ সম্মিলিত হুয়ে। অতএব উলাহ্না মুঝে হী দেনা হৈ।"

এই কথা শুনিয়া পূজারীগণ খুব মুস্কিলে পড়িলেন। তাহারা শ্রীনানকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হমলোগ জান সকতে হৈ কি আপ একেলে কিস প্রকার কি আরতি কর রহেঁ থে?" তখন গুরুনানকদেব তাহার প্রসিদ্ধ পদ "আরতির গান" আরম্ভ করিলেন—

"গগন মেঁ থালু রবি চন্দু দীপক বনে, তারিকা
মণ্ডল জনক মোতি।
ধুপু মল আনলৌ, পবণু চবরো করৈ, সগল বনরাই
ফুলন্ত জ্যোতি॥
কৈসী আরতি হোই
ভব খণ্ডনা তেরী আরতি
জনহতা, সরদ বাজন্ত ভেরী॥

শ্রীনানকদেবের দিব্য আরতিসঙ্গীতের নিবন্ধে বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূজা ও প্রার্থনা পর্য্যায়ে রচিলেন—

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে॥
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥"

আশেপাশের সমগ্র লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্রীনানকদেবের দিব্য ভক্তি সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে পর গুরুনানকদেব সমাধি মগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার দিব্যভাব ও বিভূতি দেখিয়া

সকলের মনে হইল যেন সাচ্চা জগন্নাথকে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শ্রীগুরুনানকদেবের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ তত্ত্বের বিভূতি সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। ইহাতে এই প্রমাণ হইল যে প্রকৃত জগন্নাথের অস্তিত্ব মানুষের অন্তরে উপলব্ধিত হওয়াটাই প্রকৃত পূজা ও আরতি। বাহ্য পূজার আচরণ হইল একটি সত্যের প্রকাশিত সাক্ষী স্বরূপ নিদর্শন মাত্র।

দীক্ষা

আজ থেকে প্রায় পনেরো ষোলো বৎসর পূর্বের কথা লিখছি। বাগনান মহাশ্মশানে এক সিদ্ধ মহাযোগী পুরুষ থাকতেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ১১৫ বৎসর হবে। ইনি নিজের আত্মপরিচয় কখনও দিতেন না। বহু প্রশ্ন করেও এঁর প্রকৃত নাম-ধাম পরিচয় মেলেনি। তবে যেসব মানুষেরা তাঁর নিকট যেত তারা ওঁকে "বাবা" বা "সাধুবাবা" বলেই সম্বোধন করতেন। তাঁর শুভনাম জিজ্ঞাসাবাদ করায় একদিন তিনি ভক্তদের শুধু বলেছিলেন যে তাঁর শ্রীগুরু প্রদত্ত সন্ন্যাসের নাম "ব্রহ্মানন্দ" এবং তার শ্রীগুরুদেব তাকে "পরমহংস" উপাধি প্রদান করেছিলেন। এই ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের পূর্ব পরিচয় জানা যায় না, তবে কোনও কোনও সময় তাঁর জীবনে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি তিনি বলতেন। সেই সব ঘটনা শুনে বেশ বোঝা যেত যে তিনি সুউচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন; বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বংশে বা রাজপরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি সাহেবদের আমলে সাহেবী কোনও ভাল স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সাহেবীয়ানা ও উন্নাসিক ভাবাপন্ন ছিলেন, তাই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অত সুনজর ছিল না। ২৮/২৯ বৎসর বয়সে তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। এই সময়েই তাঁর সদ্‌গুরুলাভের অলৌকিক কাহিনী ও তাঁর দীক্ষা সম্পর্কীয় অস্বাভাবিক, অসাধারণ অভিজ্ঞতাপূর্ণ সময়ের কথা তিনি নিজে বলেছিলেন। ঘটনাটি ঠিক এমন—

সেবার দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক হল যে কিছুদিনের জন্যে বারাণসীতে ভ্রমণ করতে যাবে। ব্রহ্মানন্দের বন্ধু যিনি তিনি খুব ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী বারাণসী স্থানটি ভ্রমণের জন্যে নির্বাচিত

হয়েছিল। ব্রহ্মানন্দদেবের কিন্তু বারাণসীতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর বন্ধু তাঁকে বললে—"দেখ্, এইবার যদি তোর সঙ্গে বেড়াতে যাই তবে বারাণসীতে যাব।" ব্রহ্মানন্দ—"কেন? সেখানে আবার কী আছে?"

বন্ধু—"সেখানে অনেক কিছু আছে। বাবা বিশ্বনাথ তো আছেই আর তাছাড়া বিশ্বনাথের চেলায় ভর্তি। কত বড় বড় সাধুসন্ত, কত শক্তিশালী মহাত্মা মহাপুরুষেরা সব বারাণসীতে আসে। কপালে থাকলে তাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

ব্রহ্মানন্দ—"তোর যত সব উদ্ভট চিন্তা। আমি যাচ্ছি গঙ্গার পারের স্নিগ্ধ শীতল পবিত্র বাতাস গায়ে লাগাতে। এখানের কর্মজীবনের একঘেঁয়েমি আর সইছে না। যেখানে হোক একটা কোথাও যাবার ইচ্ছা প্রবলভাবে হচ্ছে। চল্ তোর পছন্দের ঐ বারাণসী না কাশী, সেখানেই যাওয়া যাক্।"

তারপর দুজনে বারাণসীতে আসেন। প্রথমদিন তো ট্রেন থেকে নেমে সব গোছগাছ করতে করতেই কাটল। দ্বিতীয়দিন সকালটায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে কাটানোর পর দুপুরে বেশ বেলায় একটা সাধারণ হোটেলে দুই বন্ধুতে আহার করতে বসেছে, খাদ্যসম্ভার সব নিজেদের পছন্দমত অর্ডার দেওয়া অপেক্ষায় রয়েছেন দুজন, এমন সময় বিরাট হুংকার মত আওয়াজ দিয়ে এক অতি দীর্ঘকায়া, প্রায় সাড়ে ছয় ফিট্ লম্বা হবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং, এক জটাজুটধারী কৌপীন পরিধৃত সন্ন্যাসী হোটেলের খাওয়ার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। সেই সন্ন্যাসীর হস্তে এক সুদীর্ঘ দণ্ড ছিল। অল্প সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে, একটু জোরের সঙ্গে সন্ন্যাসী হিন্দীতে বলতে লাগলেন—"হম্ এ্যায়সে এক আদমীকো ঢুণ্ড রহে হৈ জিসকা দীক্ষা অভিতক নহী হুয়া হৈ। ইয়ে স্থান পর কৌন হৈ জিনকে দীক্ষা নহীঁ হুয়ী হৈ?"—কিছুক্ষণ সময় সেই স্থানটা একদম স্তব্ধ হয়ে গেল। কারুর মুখে আর কোনও কথাই বেরোচ্ছে না। সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার সাধু বলতে লাগলেন—"জিনকী দীক্ষা নহীঁ হুয়ী হৈ উনকো থোড়ী দের মে পতা চল জায়েগা। মৈ আজ রাত বারা বজে হরিশচন্দ্র ঘাট কে উপর উনকে লিয়ে

অপেক্ষা করুঙ্গা। উনকো মেরে পাস জরুর আনা চাহিয়ে।" ঐ একই কথা আরও দুই বার বলে খুব দ্রুত সন্ন্যাসী হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই সম্বিৎ ফিরে পেল। আবার সেই সন্ন্যাসীকে ঘিরেই কথাবার্তা হতে লাগল। এরই মধ্যে বন্ধুবর দ্রুত একবার বাইরে থেকে ঘুরে এলেন। বললেন—"নাঃ ত্রিসীমানায় আর কোথাও নেই।" যাই হোক্, সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ রেখে আলোচনা হবার পর ঠিক হল যে সেই সময় যারা সেই স্থানে ছিলেন তাদের মধ্যে কার কার দীক্ষা হয়েছে আগে দেখা যাক্। অনুসন্ধান করতে করতে দেখা গেল যে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ছাড়া অন্য যারা সব ছিলেন তাদের সকলেরই পূর্বে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। অতএব ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করেই যে সন্ন্যাসী ঐ কথাগুলি বলে গেছেন এ বিষয়ে আর কারো সন্দেহ রইল না। কোনও মতে খাওয়া দাওয়া সেরে দুই বন্ধুতে নিজেদের বাসস্থলে ফিরে এলেন। ততক্ষণে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে তো তুমুল আলোড়ন হয়ে চলেছে। কিন্তু তাঁর বন্ধু স্থির ও অটল। বন্ধু তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে সাধুসন্তের অত্যাশ্চর্য্য সব আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নেওয়া উচিত। তাঁরা তো সাধারণ মানুষ নন, তাই তাঁদের সাধারণ মানুষ চিন্‌তে পারে না। ব্রহ্মানন্দের জীবনে এমন অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভের সময় এসে গেছে তখন সন্ন্যাসীর নিকট গমন করাই উচিত, ইত্যাদি। যাইহোক্, অবশেষে মন ঠিক করে মনে বল এনে ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন সেইরূপ মনস্থ করলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কোলে সূর্য্যাস্ত হয়ে গেল। ক্রমশঃ রাত্রি ঘনিয়ে আসতে লাগল। যত সময় কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করলেন যে তার মন যেন ততই দৃঢ় ও শান্ত হয়ে আসছে। এক অব্যক্ত অদৃশ্য শক্তি যেন তার সমগ্র মনকে স্থির নিশ্চল অটল প্রশান্ত করে দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসী অভিমুখে হরিশচন্দ্র ঘাটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

সেখানে পৌঁছে দেখলেন সেই জটাজুট সমাদৃত বিশালকায় সন্ন্যাসী তাঁর আগমনের অপেক্ষায়ই তথায় দণ্ডায়মান আছেন। ব্রহ্মানন্দের মনে সাময়িক ভাবে যেন কী হয়ে গেল। সন্ন্যাসীকে দর্শন মাত্রই তাঁর সন্নিকটে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ তাঁকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী বললেন—"বেটা! তেরে লিয়ে বহুত দিন ইহাঁ ডেরা লগানা পড়া। অব ঔর সময় জ্যাদা বাকী নহীঁ হৈ। জলদি চলো মেরে সাথ।"

ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসীর কথা শুনে ভেবেই পেলেন না। "ঔর সময় জ্যাদা বাকী নহীঁ হৈ"— এই কথাটার মানে কি হতে পারে? মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অন্ধকারে পথ চলার পর একটা মাটির তলায় গুহায় গিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন। গুহার ভিতরে গভীর ঘন অন্ধকার; কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। একটু ভিতরে প্রবেশ করতেই সেজের বাতি জ্বলছে দেখা গেল এবং ঐ বাতির সামান্য আলোতেই গুহার ভিতর যেন আলোকিত হয়ে আছে। তারই মধ্যে ব্রহ্মানন্দ দুটি আসন পাতা রয়েছে, দেখতে পেলেন। একটি আসনে সন্ন্যাসী গিয়ে উপবেশন করলেন এবং অন্য আসনটি, যেন বহুদিন কেউ ব্যবহার করেনি, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে ছিল। সন্ন্যাসী বললেন—"যাও বেটা, দের কিউ করতে হো? পহচান নহীঁ সকতে হো কি ব্‌হ্‌ তেরাহী আসন হৈ!! ইস আসন পর তুনে পূরব জনম মে দেহ ছোড় দী থী, উস সময় সে মৈ হী সম্‌হাল্ রহা হুঁ। অভী ফির সময় আ গয়া; তু যাকে আসন লে লে।"

অবাক বিস্ময়ে ব্রহ্মানন্দ যন্ত্রচালিতের মতো আসনে গিয়ে বসলেন। বসার সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে অব্যক্ত শিহরণ এবং অবসন্নতা বোধ করতে লাগলেন। তখনও সন্ন্যাসী বলে চলেছেন—"মেরা সময় ঔর নহীঁ হৈ। সাত দিন বাকী রহ্ গয়া। ইন সাত দিনোঁ মেঁ সারী বিদ্যা মৈ তুঝকো সৌঁপ দুঙ্গা। সাতদিনকে বাদ হম ইহ শরীর ত্যাগ দেনে বালে হৈঁ। অনেক কষ্টে ব্রহ্মানন্দ একবার বললেন—"মাত্র সাতদিনে সমগ্র বিদ্যা কেমন করে নেবো!!"

সন্ন্যাসী বললেন—"তু চিন্তা ন কর বচ্চা। মৈ জো জো কহুঙ্গা বহ মন লগাকে শুন্। মেরী বাত শুনতে শুনতে সাতদিন বীত জায়েঙ্গে। বাদমে আপনে আপ হী সব সমঝ সকো গে।" ব্যস্, আর কোনও কথাই ব্রহ্মানন্দ বলতে পারেন নি সন্ন্যাসীকে। সাতদিন অবিরত ফল্গুধারার মত জ্ঞানের কথা সন্ন্যাসীর মুখ থেকে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। ব্রহ্মানন্দ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলে গেছেন, কোনও কষ্টবোধও নেই। আর সন্ন্যাসী বলে চলেছেন। সে যেন এক মহান বিরাট স্বপ্ন। তারপর একসময় সন্ন্যাসীর কথা ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে কথা বন্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর দেহ স্থির হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের মস্তকে যেন প্রচণ্ড বেগে একটা বজ্রপাত হয়ে পড়ল। তারপর আর তাঁর কোনও কিছুই স্মরণে নেই। কতদিন পর যে তাঁর চেতনা হয়েছিল তা হিসাব করে পরে জানতে পেরেছিলেন প্রায় দিন কুড়ি হবে। চেতনা আসতেই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মানন্দের নিকট নূতন বলে মনে হয়েছিল। তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন যেন এক নবীন মানবের নব চেতনার রঙে রসে তিনি প্রবুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর আরও কিছুদিন পর নানান আশ্চর্য্যান্বিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে মহাশক্তির ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ব্রহ্মানন্দের মধ্যে হতে লাগল, তিনি এমনই উপলব্ধি করলেন। পরমারাধ্য গুরুর দেহকে সেই গুহার অভ্যন্তরে সমাধি দিয়ে ব্রহ্মানন্দ গুহা হতে বেরিয়ে প্লুত সলিলা পবিত্র গঙ্গায় স্নান করলেন। তারপর আবার গুহার ভিতরে সাধনায় মগ্ন হলেন তিনি। এই সাধনায় অতিদ্রুত তাঁর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অতিন্দ্রিয় অনুভূতি সকল প্রকটিত হতে লাগল। শ্রীগুরুদেব নিত্য তাঁর নিকট জ্যোতিরূপে প্রকটিত হতে লাগলেন। তারপর শ্রীগুরুর আদেশ আসতে লাগল তাঁর কাছে। বারাণসীতে বেশ কিছুকাল কাটানোর পর তাঁর উপর আদেশ হল, এবার বারাণসী ছাড়বার জন্যে। এবার হিমালয়ে চলে যাবার আদেশ পেলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে পুণ্যসলিলা গঙ্গায় স্নান সেরে হরিদ্বারের পথে রওয়ানা হলেন তিনি।

তারপর দৈবাদেশ অনুসারে অন্য কোনও পাহাড়ী সাধুর দর্শনলাভ করায় ব্রহ্মানন্দ হিমালয়ের গহনে অন্য গুহায় চলে যান। হিমালয়ে বহু কাল অবস্থান করার পর তিনি উনসত্তর বৎসর বয়সে আবার গুরুর নির্দেশে লোকালয়ে নেমে আসেন। (যখন তিনি প্রথম লোকালয়ে হরিদ্বারে পদার্পণ করলেন, সে অবস্থার একখানা ফটো আমি দেখেছিলাম—তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে ৩০/৩২ বৎসর বয়সের একজন যুবক মাত্র)। এরপর লোকালয়ে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করার পর অবশেষে বাগনান মহাশ্মশানে উপনীত হন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করার পর বাগনানেই দেহত্যাগ হয়।

ব্রহ্মানন্দদেবের দেহ ত্যাগের ঘটনাও অলৌকিক। তিনি নিজেই দিনক্ষণ সময় সব বলে, নিজের সমাধি নিজে রচনা করে, সেই সমাধিতে আসনে উপবেশন করা অবস্থায় মহাসমাধিতে বিলীন হন। এ হেন সাধুর প্রচার ছিল না। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাঁকে অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাঁর পিতৃসুলভ আচরণ, মমতাপূর্ণ স্বভাব, স্থানীয় মানুষদের নানাভাবে দুঃসময়ে সহায়তা দান, আস্থাপ্রদান ইত্যাদি করার জন্যে তিনি বহুমানুষের পূজা প্রাপ্ত হতেন। তাঁর দেহ ত্যাগের সময় বয়স হয়েছিল ১১৬ বৎসর।

"জাগ্রত ইচ্ছা হতে উত্থিত জীবন
তাই হয় সত্তারই পরম আপন॥
সৃষ্টির তরঙ্গ মাঝে আন্দোলিত
কর্ম করে কর্মীরূপে কাল কবলিত॥
জ্ঞান বরষে কর্ম রহিত হয় যে জীবন
ভক্তি রসে সিঞ্চিত হয় বিশুদ্ধ সাধন—
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি লয়ে অস্তিত্ব মহান
এই হল ঐতিহ্যসম স্বপ্রকাশ সনাতন॥"—জীবন

—শ্রীশ্রীমা

"জ্ঞানের আলোকে চেয়ে দেখে আঁখি
সত্যের দিব্য প্রকাশ—
চৈতন্যময় জগৎ মাঝারে মোরা থাকি,
খেলি লুকোচুরি করি পরিহাস॥
ভুলিও না কভু তোমরা যে সবে
সে অমৃতেরই সন্তান।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ব্রহ্ম নিরখি
জেনো তাহা সুমহান॥"—প্রকাশ

সংযোগ

আজ হইতে প্রায় সত্তর-আশি বৎসর পূর্বের কাহিনী বলিতেছি। উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পার্বত্য পরিবেশ সন্নিবেশিত রূপনগর গ্রাম। সে সময় তথায় জমিদার বংশীয় ঠাকুর সম্প্রদায়ের অত্যাচার চলিতেছিল। গ্রামাঞ্চলের জনমানব উহাদের আচরণে তটস্থ ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ওই গ্রামের মধ্যবিত্ত এক সদ্‌ব্রাহ্মণ পরিবারে "দুর্গা" নাম্নী অপরূপা অসাধারণ এক কন্যার জন্ম হয়। বাল্যকালেই দুর্গা তাহার পিতা ও মাতাকে হারায় এবং কাকা ও কাকীমায়ের তদারকিতে তাহাদের নিকট বড় হইতে থাকে৷ দুর্গা যেন পটে আঁকা দেবী দুর্গা। তাহার পিতামাতার সর্বস্ব সম্পদ ও বিষয়সম্পত্তি সমগ্রই কাকা ও কাকীমায়ের নিকট গচ্ছিত ছিল। সম্পত্তির লোভে একদিন গ্রামের দুষ্টমতি নায়েবের সহিত কাকা-কাকীমা কুপরামর্শ করিয়া দুর্গাকে নায়েবের কাছে গোপনে বিক্রী করিয়া দিল। তখন দুর্গার বয়স মাত্র ষোল। গ্রামের অন্যান্য লোকেরা এ বিষয় কেহই জানিতে পারিল না। একদিন রাত্রে লাঠিয়াল সমেত পাল্কী আনিয়া নায়েব মশাই জোর জবরদস্তি মেয়েটিকে পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া চলিল। অত অল্প বয়স্কা কুমারী মেয়ে দুর্গা, এ বিষয়ে তাহার আর কি করিবার আছে? যেখানে তাহার নিজ পিতৃব্যই তাহার শত্রুপক্ষ; আর ইহ জগতে তাহার কেহ নাই। আছেন শুধু ভগবান। বাল্যাবস্থায় পিতার সান্নিধ্যেই ভগবানের শক্তি ও ভক্তির বিষয় সে শুনিয়াছিল। পিতা ছিলেন নৈষ্ঠিক ভক্ত মানুষ; তাই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস শৈশব থেকেই দুর্গার মনে স্থান পাইয়া গিয়াছিল। এখন সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভরতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

রাতের অন্ধকারে গহন ঘন পার্বত্য জঙ্গলের মধ্যদিয়া সরু পথে হেলিয়া দুলিয়া পাল্কী চলিতেছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে এই দুর্গা; পাল্কীতে চলিতে চলিতে পর্দা উঠাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ আরও গভীর রাত্রি নামিয়া আসিল। এমন সময় হঠাৎ দুর্গার মনে এক অসীম সাহসিকতাপূর্ণ দৃঢ়তার উদয় হইল। মুহূর্তে তাহার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিকের মত বুদ্ধি আসিয়া গেল। তার পরমুহূর্তেই পথের পার্শ্ববর্তী খাদের মধ্যে পাল্কী হইতে দুর্গা দিল এক লাফ। ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে খাদের দিকে নামিতে লাগিল। আশেপাশের গাছের ডালপালাকে আশ্রয় করিয়া কিছুটা নামিবার পর সে দেখিল যে একটা পথের নিশানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে নায়েবের লাঠিয়ালদিগের হৈ হৈ চীৎকার ও হুড়োহুড়ির শব্দে, তাহাকে যে ঐ দস্যুগণ খুঁজিতেছে তাহা সে খুব বুঝিতে পারিল। দুর্গা সমুখস্থ পথের নিশানা ধরিয়া চলিতে লাগিল। দ্রুত চলিতে চলিতে হঠাৎ দস্যুগণের মধ্যে একজন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল। এই পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী জঙ্গলের বাহিরে যাওয়া অসাধ্য। তথাপি কোনও দিক্‌বিদিক না ভাবিয়াই দুর্গা ছুটিতে লাগিল। পিছন পিছন দস্যুটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, সেও অতি দ্রুত আসিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সামনে একটা গুহার ভিতরে দেখা গেল আলোর নিশানা; দুর্গা সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল এবং গুহায় প্রবেশ করিবার পর দুর্গা যাহা দেখিল তাহা অচিন্ত্যনীয়! হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কৌপীনধারী এক মধ্যবয়স্ক সন্ন্যাসী হোমকুণ্ড পার্শ্বে উপবেশিত এবং অকস্মাৎ এক রমণীকে দর্শন করিয়া তিনিও বিস্মিত। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। একজন অন্যজনকে বিস্মিত হইয়া দেখিতে ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাহিরের অন্য মানুষের আওয়াজে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য গুহার বাহিরের দিকে গেল। মুহূর্তমধ্যে সন্ন্যাসী তাহার পার্শ্ব হইতে একখানা ধারালো ছুড়িকা হস্তে তুলিয়া লইয়া গুহার দ্বারপানে গেলেন। তারপর! একবার, দুইবার মনুষ্যের আর্তনাদ; আবার সব স্তব্ধ নিশ্চল পরিবেশ।

সন্ন্যাসী তাহার নির্ধারিত আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। তিনি শান্ত ধীর সুস্থির। দেখিয়া মনে হইল তাহার মধ্যে চঞ্চলতার লেশমাত্র নাই। রক্তমাখা ছুরিকাটি কমণ্ডলুর জলে ভাল করিয়া ধৌত করিয়া পাশে রাখিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত রহিলেন। তারপর যেন কাহারও উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। তারপর হোমাগ্নিতে আবার আহুতি দিলেন, তারপর দুর্গার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এইমাত্র, তোমার বিষয়ে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব সবই বলিয়াদিলেন।" তোমার নাম কি "দুর্গা"? দুর্গা মাথা নাড়িয়া সায় দিল। সন্ন্যাসী "আজ রাত্রিটা এ গুহাতেই থাকো। কাল শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তোমায় লইয়া তাঁহার নিকট যাইব। তারপর তাঁহার যাহা আদেশ হয় সেইমত করিতে হইবে। ইহাই আমার গুরুদেবের অভিমত। ইহা ভিন্ন তোমার যদি অন্য মতামত থাকে তবে জানাইও।"

ইহাভিন্ন আর দুর্গার কি মতামত থাকিতে পারে? তাহার তো তিনকূলে কেহ নাই। বাল্যকাল হইতেই সে কাকা ও কাকীমায়ের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে। কাকা ও কাকীমা তাহার পিতৃদত্ত বিষয়সম্পত্তি সবই লইয়াছেন। আর উহাদের নিকট ফিরিয়া না যাওয়াই শ্রেয়, দুর্গা এইরূপ ভাবিতে লাগিল। দুর্গার মুখে কোনও কথা নাই দেখিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিলেন "এই নাও কম্বল, আজ রাত্রিটা এখানেই শুয়ে পড়।" কম্বলখানি লইয়া দুর্গা গুহার একপার্শ্বে পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সমগ্র দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে দুর্গা খুব অল্পসময়ের মধ্যেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

"ভোর হল; এবার ওঠো। বহুদূর যেতে হবে, জলদী করো।" ইত্যাদি কথার আওয়াজে দুর্গা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দেখিল যে সন্ন্যাসী একটি ত্রিশূল হস্তে ও কাঁধে ঝোলা লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন এবং তাহারই উদ্দেশ্যে এ সকল কথা তিনি বলিতেছেন। কথার কোনও প্রতি উত্তর না করিয়া, বাহিরের পার্বত্য ছোট্ট একটি ঝরণার জলে হাত মুখ ধুইয়া লইয়া,

তারপর তাহারা দুইজনে গুরু আদিষ্ট লক্ষ্যের পানে পদব্রজে যাত্রা করিল। পথে চলিতে চলিতে দুর্গা ভাবিতে লাগিল পূর্ব দিনের সেই ভয়ংকর রাত্রির কথা। এই মুহূর্তে সে অজানা অচেনার সন্ধানে চলিয়াছে, তবুও আগের মতন তেমন আতঙ্ক ও ভয় তাহার মনে আসিতেছে না। সন্ন্যাসীর সৌম্য শান্ত স্বভাব ও তাহার আচরণ দুর্গার মনে আনিয়া দিয়াছে পরম নির্ভরতা। পার্বত্য পথের মধ্য দিয়া ছোট ছোট গ্রাম ও শহরতলি সকল পদব্রজে তাহারা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সম্মুখে হিমবাহ সমাদৃত শ্বেত তুষার পরিবৃত হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গাদির দৃশ্য অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর। চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী বলিলেন— "আমরা যেখানে যাব, তথায় তিন-চার দিনের পথ। উহা গহন ঘন হিমালয়ের অতীব গোপন এক পার্বত্য অঞ্চল। তথায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বহু সাধু সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন এবং গুহায় গুহায় তাঁহারা আপন আপন ঈশ্বরীয় ধ্যানে নিমগ্ন রহেন। সে স্থানের নাম ব্যাসপীঠ। আমরা মণিমহেশের পথে অগ্রসর হইতেছি। মণিমহেশের পার্বত্য অঞ্চল পার হইয়া, পার্বত্য ঘন জঙ্গল অতিক্রম করিবার পর সে স্থানে গমন করিব। তথায় আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের আশ্রম আছে।" ... দুর্গা নির্বাক। তাহার মুখে কোনও কথাই নাই। সে শুধু শুনিতেছে, অবাক হতবাক বিস্ময়ে। সন্ন্যাসীর পরম আরাধ্যের উপর তাহার ক্রমশঃই অতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হইতেছে। ঈশ্বর কি? ভগবান কে? তাহা তাহার জানা নাই। শৈশবে পিতার নিকট ঈশ্বরের নামগান মহিমার বহু কাহিনী সে শুনিয়াছে; তাই সে ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু আজ মনে হইতেছে যে, যেন আগতকালে ঈশ্বরকল্প মহামানবের মধ্যেই সে তাহার আপন ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারিবে। সেই আকাঙ্ক্ষায় দুর্গার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। সে চলিতেছে, অবিরাম চলিতেছে। শুধু পথ আর পথ; আবার পার্বত্য জঙ্গলাকীর্ণ পথ। তাহাতে চলিতেও যেন আর কষ্টবোধ নাই। কোনও এক অব্যক্ত শক্তি তাহাকে যেন সেই পথে চলিতে সাহায্য করিতেছে।

দিন যায়, রাত্রি যায়; কয়েকদিন এমনি করিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তাহারা গন্তব্য স্থলে আসিয়া পৌঁছিল। দূর হইতে সন্ন্যাসী সুউচ্চ এক জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকা অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাহাকে বলিল— "আমরা ঐ ওখানে যাব। আর দূর নয়, এবার এসে পড়েছি।" ধীর মন্থরগতিতে উতরাইয়ের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে তাহারা শীর্ষস্থানে আসিয়া পৌঁছাইল। সেথায় সবই শান্ত; প্রকৃতিও যেন শান্ত সমাহিত। সমগ্র পরিবেশের মধ্যে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির প্রকাশ। অবোধ বালিকা এই দুর্গা। তাহার মনও তাহারই অজান্তে সেই প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে কে যেন ডাকিতে লাগল—"শিবশংকর! শিবশংকর! বেটা তুম আ গয়া। রস্তে মে তুমকো কোই তক্‌লীফ তো নহীঁ হুয়া বেটা, মৈ তুমহারে লিয়ে অপেক্ষা কর রহা হুঁ, তুম ভিতরমে মেরে পাস আও ঔর উনকো ভী সাথ মে লাও।"

সন্ন্যাসী দুর্গার প্রতি তাকাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন যে তাহাদের উদ্দেশ্যেই ডাক আসিয়াছে। ঐ সামনের অল্প জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যাইতে হইবে। ঐ জঙ্গলের ভিতরেই গুরুবাবার গুফা। দুর্গা ভাবিতেছে, লোকটিকে তো দেখিবার উপায় নাই ; তবে ওঁই বা ওদের দেখিতে পাইতেছে কি করিয়া? অন্তর্যামী না হইলে তো ইহা সম্ভব নয়। জঙ্গল অতি অনায়াসেই ডিঙাইয়া গুফার দরজা দিয়া উহারা দুইজনে গুফার ভিতরে প্রবেশ করিল। গুফার ভিতরে সরু রাস্তার মতো কিছুটা গেলেই তারপর এক সুবিশাল কক্ষ। তথায় স্থূলকায়া পাহাড় প্রমাণ এক শ্মশ্রুকুন্তল সমন্বিত সন্ন্যাসী যোগী মহাপুরুষ সিদ্ধাসনে তাঁহার প্রজ্জ্বল্যমান ধুনীর সম্মুখে উপবেশিত আছেন। চক্ষু তাঁহার নিমীলিত। নিশ্চল প্রশান্ত মুখাবয়ব। তাঁহাকে দেখিয়া দুর্গার একটু একটু ভয় হইতে লাগিল। যোগীরাজ বলিলেন— 'তুম্ ডরো মত বেটী। ইয়ে শিবশকংর হৈ। মেরা জনম্ জন্মান্তর কা মানসপুত্র ঔর তুম মেরী মানস কন্যা। জনম্ জনম্‌কে বন্ধনকে বাঁধা হুয়া তুম দোনো কা রিস্তা হৈ। ইসলিয়ে

তো ভগবান নে কালচক্রমে ফঁসাকর তুম দোনো কো ফিরমিলা দিয়া হৈ। আজ মুহ্ হাথ্ ধো কর বিশ্রাম করো। কল্, তুম কো মৈ ইস পবিত্র ধুনীকে সামনে সম্প্রদান করকে, দোনো কা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করুঙ্গা। শিবশংকর, ইনকে রহনে কা স্থান দিখা দো। তুম দোনো কে সাথ কল ফির মিলেঙ্গে।”

দুইজনে গুফার বাহিরে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। সন্ন্যাসী আগে আগে চলিতে লাগিলেন এবং পিছনে দুর্গা। অল্পদূরেই আরও একটা গুফায় দুর্গাকে অবস্থান করিবার জন্য সন্ন্যাসী দেখাইয়া দিলেন। তিনি ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন, “কোনও ভয় নাই, ইহা পরম পিতৃদেবের যায়গা অতএব, নির্ভয়ে অবস্থান কর।” এই বলিয়া শিবশংকর অন্য আরেক গুফায় চলিয়া গেলেন। সমগ্র দিবসে শুধুমাত্র একটি বার সন্ন্যাসী আবার আসিয়া ছিলেন। ছোলা এবং গুড় ও পানীয় জল আহার করাইয়া গিয়াছেন। শিবশংকর ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন যে, ইহার অধিক কিছু আজ জুটিবার সম্ভাবনা নাই।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব আলো দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির-মনোহর সৌন্দর্য্য দুর্গাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিল। ক্রমশঃ দিবসের অবসানে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন ও সন্ধ্যার কোলে রাত্রি নামিয়া আসিল। দুর্গা গুহার ভিতরেই অবস্থান করিতে ছিল। কিন্তু একাকী থাকা সত্ত্বেও তাহার মনে কোনও ভয় নাই। সেই পরমপিতাসম কল্যাণময় পুরুষের মূর্তিই তাহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল বারম্বার। তাঁহার উদ্দেশ্যে “বাবা”, “বাবা” জপ করিতে করিতে দুর্গা ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার অজান্তেই সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে দুর্গা শুনিতে পাইল “বাবা”র কণ্ঠস্বর। তাহাকেই ডাকিতেছেন বাবা— “উঠো দুর্গামাঈ, মেরী বচ্চী; জলদী করোঁ। আও মেরে পাস।” সমগ্র গুহার ত্রিসীমানায় কেহ কোথাও নাই, অথচ গুরুবাবারকণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র দুর্গা উঠিয়া পড়িল।

একটু পরেই দেখা গেল, গৈরিক বস্ত্রপরিধৃত সদ্য স্নান করিয়া শিবশংকর সন্ন্যাসী দুর্গাকে লাইয়া যাইবার জন্য গুহায় আসিয়াছেন। তিনি

বলিলেন— "বাবার আদেশ। তুমি ঝরণার জলে স্নান করে এস। তারপর তোমায় নিয়ে যাব।"

দুর্গা স্নান করিয়া আসিল। তাহারপর দুজনে বাবার গুহাভিমুখে চলিল। গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল যে আরও জনা কয়েক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী প্রবর সব সারিবদ্ধভাবে বসিয়া আছেন। শিবশংকর উহাদের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া দুর্গাকে বলিলেন, "এঁনারা আমার গুরুভ্রাতা। আজকের শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেছেন।"

তারপর দুইজনে দুটি আসনে সামনাসামনি বসিলেন। সামনে পবিত্র অগ্নি এবং মধ্যস্থলে আসনে পিতৃদেব উপবেশিত আছেন। তারপর পিতৃদেবের শ্রীমুখ হইতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। দুইজনের হস্ত একত্র ধরিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শিবশংকর ও দুর্গার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পর পিতৃদেব শিবশংকরকে বলিলেন— "আজ ইহাঁ রহনা; কল্ ইহাঁ সে অপনা স্থান পর শুভ যাত্রা করনা হৈ। মেরা আশীষ সদা সর্বদা তুম দোনো কে সাথ রহে। শিবশংকর, বচ্চা, তুম্হী শুভক্ষণমে হমারা দুর্গামাঈকো যোগদীক্ষা দান করোগে।" এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শিবশংকর দুর্গাকে লইয়া তাহার নিজস্ব গন্তব্যের প্রতি চলিয়া গেলেন। তারপর ঈশ্বর আদিষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুবাবার আদেশ লাভ করিয়া, শিবশংকর তাহার নিজ গুহায়, নির্দিষ্ট শুভদিনে দুর্গাকে যোগদীক্ষা প্রদান করিলেন। একই গুহায় তাহাদের দাম্পত্য জীবন যোগসাধনায় কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একে একে সকল সাধন'র স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া "দুর্গা" আনন্দ সমাধি অবস্থালাভ করিয়া শিবাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এই দুইজন পরমহংস ও পরমহংসী একই সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটাইলেন। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে কিছুলোক তাহাদের সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল। দুর্গা, দুর্গা হইতে "দুর্গামাঈ" হইয়া গেলেন।

এইভাবে কিছুকাল বেশ চলিতেছিল। দৈবাৎ একদিন শিবশংকরের মনে ভারত পরিক্রমা করিবার ইচ্ছা জাগিল। দুর্গামাঈ বলিলেন—"তোমার গুরু অনুমতি দান করিলে আমার কোনই আপত্তি নাই, যাইতে পারো।" শিবশংকর গুরুবাবার অনুমতি চাহিলেন। পিতৃদেব বলিলেন—"পরিক্রমা করনে চাহতে হো, মগর মাইকে পাস নির্দিষ্ট সময় মে লৌটনা হোগা।" অর্থাৎ যেতে চাইছো যাও কিন্তু যবে ফিরিবার সময় ধার্য্য করিয়া বলিয়া যাইবে তখনই ফিরিতে হইবে। ইত্যাদি...

দণ্ডীস্বামী শিবশকংর তীর্থ পর্য্যটন ও ভারত পরিক্রমায় বাহির হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে তিন চার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ভারত পরিক্রমা করিবার সময় শিবশংকর ঋষি অরবিন্দকে দর্শন করিতে পণ্ডীচেরীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার পর শিবশংকর মাতৃভূমির প্রতি এক অনবদ্য আকর্ষণ অনুভব করিলেন। শিবশংকরের ছিল বাঙালী শরীর। তিনি পূর্বাশ্রমে শ্রীরামপুর নিবাসী ছিলেন। তখন ইং ১৯৩১ সাল; এই সময় শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত সন্ত শ্রীমৎ স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ অবস্থান করিতেন। ইনি ছিলেন একজন ব্রহ্মর্ষি ঋষিকল্প মহাত্মা। শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য ছিলেন যুক্তেশ্বর বাবা। এঁনারই সান্নিধ্যলাভের আশায় শিবশংকর শ্রীরামপুরে আসিলেন। এই মহান সাধুর সান্নিধ্যে প্রায় দু-তিন বৎসর কাল কাটাইলেন। এঁনাদের দুজনার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ, একদিন, ইং ১৯৩৪ সাল, শিবশংকর তখন আসনে ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় মানস নয়নে অন্তরাকাশে দেখিলেন গগনভেদী প্রণব ধ্বনি হইতে হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম আলোক বিন্দু মহাকাশ ভেদ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরমুহূর্তেই শিবশংকর যোগবলে জানিতে পারিলেন, শ্রীযুক্তেশ্বরগিরি মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরের দিন হইতে এক অবসাদ যেন মনকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার। এই ঘটনার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই

একদা ব্রাহ্ম মুহূর্তে শিবশংকর তাহার শ্রীরামপুরস্থিত আবাসস্থলে যোগবলে আপন সাধনকক্ষে দেহত্যাগ করেন। ...

অন্যদিকে, হিমালয় পাহাড়ের গহন গুহার আরেকটি দৃশ্য—ধুনী প্রজ্জ্বলিত সম্মুখে, আসনে উপবেশিতা দুর্গামাঈ। তিনিও ঐ একই সময়ে মহাকাশভেদী প্রণব ধ্বনি শ্রবণকরতঃ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম তীব্রগতিবেগ সম্পন্ন আলোক বিন্দুকে চলিয়া যাইতে দেখিলেন। তার পরমুহূর্তেই অন্তরাকাশ আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন গুরুবাবা শ্রীআদিনাথ ভগবান। তিনি বলিলেন— "শিবশংকর নে দেহ ত্যাগ দে দিয়া মাঈ; ইয়ে দুঃখ কী বাত হৈ"— তারপর মুহূর্তেই গুরুবাবা দেখিলেন— এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিন্দু দুর্গামাঈয়ের দেহ হইতে নির্গত হইয়া প্রণব ধ্বনি করিতে করিতে মহাকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গামাঈও দেহ ত্যাগ করিলেন।

শুনিয়াছি দুর্গামাঈ উত্তরপ্রদেশ কাংড়া পার্বত্য অঞ্চলের বেশ প্রসিদ্ধ সাধিকা ছিলেন। তিনি তাঁহার গুহা ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও যাইতেন না। অল্প কিছু শিষ্য ভক্তও তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর ভক্তশিষ্যগণ দুর্গামাঈয়ের সমাধি সযত্নে তৈয়ার করিয়া দেন।

অবিস্মরণীয়

বুদ্ধবাবু ছিলেন একজন প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ। হিমালয়ের আনাচে কানাচে বেড়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। যুবক বয়সে বুদ্ধবাবুর অন্তরে ধর্মভাবের সংস্কার পরিপূর্ণাকারে প্রকটিত না হইলেও তিনি Nature loving man বলিয়াই হিমালয় যাত্রা করিতে খুব ভালবাসিতেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যতাপূর্ণ বহুবিধ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিষয় তাঁহাকে এতই আকৃষ্ট করিত যে তিনি হিমালয়ের সৌন্দর্য তাঁহার Holy Kailash and Manas Sarovar নামক (প্রসিদ্ধ প্রথম হিমালয়ের উপর নির্মিত documentary film) Cinemaটিতে নিখুঁতভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। হিমালয় পর্বতের দুর্গম গিরি কন্দরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক জটাজুট মণ্ডিত শিবস্বরূপ মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন। সে সময় বুদ্ধবাবু যোগাসন শিক্ষক হিসাবে "গুরুজী" এবং "বুড্ডাদা" বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছিলেন। মহাপুরুষের দর্শনলাভ ও তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি নিজ ভবিষ্যৎজীবনের এক পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিত পান। শিবস্বরূপ মহাত্মা তাহাকে বলিলেন— "তোমায় বিবাহ করিতে হইবে। তুমি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন কোনও যোগের বিষয় লইয়া সুদূর আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ভ্রমণকরতঃ বিদ্যা শিক্ষাদানে অভূতপূর্ব মানমর্যাদা লাভ করিবে। তাই মহামানব মুনি ঋষিগণের পরম প্রিয় তুমি হইয়া উঠিবে। তোমার আধারের মাধ্যমে ভারতীয় সাধুসন্তের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ চিন্তার ধারা প্রকাশিত হইবে দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু একটি কথা আছে। তা হইল, যখন তুমি আমেরিকায় পাড়ি দিবার জন্যে উড়োজাহাজে চড়িবে সেই যানটিতে বৃহৎ এক দুর্ঘটনা ঘটিবে—অর্থাৎ Aeroplaneটিতে accident হইবে।" এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী

শ্রবণে বুদ্ধবাবু তাঁহাকে বলিলেন—"এটা কেমন কথা হইল? একধারে আপনি বলিতেছেন যে আমি বিদেশে প্রসিদ্ধ হইব, অথচ যে যানে বিদেশে পাড়ি দিব সে যানটিই যদি accident হইয়া গেল, তবে আমিও তো মরিয়া যাইব। তবে আমার দ্বারা মুনি ঋষিদের কর্ম কেমন করিয়া সাধিত হইবে?"—উত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন—"তুমি চিন্তা করিও না। যখন উড়োজাহাজটিতে আগুন ধরিয়া accident হইবার সম্ভাবনা হইবে তখন তুমি আমাকে স্মরণ করিও। দেখিবে, যে যানটিতে তুমি যাইতেছ সেইখানে তোমার পাশের seatটা প্রথম থেকেই খালি থাকিবে এবং তোমার পার্শ্ববর্ত্তী ঐ খালি সিটটায় দুর্ঘটনার সময় আমায় স্মরণমাত্র আমার দর্শন পাইবে। তুমি নির্ভয়ে থাকো। ভবিতব্য যাহা হইবার তাহাই হইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে।"

ঐ ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এরই মধ্যে বুদ্ধবাবুর বিশ্বশ্রী শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সন্তান সন্ততিও হইয়াছে। যোগাসন শিক্ষক যোগাচার্য্য শ্রীবুদ্ধ বসু মহাশয় বহু গুণীমানী সমাজবরেণ্য ব্যক্তির নিকট "গুরুজী" আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। কিন্তু মহাত্মার সেই ভবিষ্যদ্বাণী তখনও ফলবন্ত হয় নাই।

তারপর একদিন বুদ্ধবাবুর আমেরিকায় ডাক আসিল। অতি সুষ্ঠুভাবে Passport, Visa ইত্যাদি সব তৈয়ারী হইয়া গেল এবং Pan American Airlines-এর প্লেনে নির্দ্দিষ্ট দিনে তার যাওয়ার পরিকল্পনা সত্যে পরিণত হইল। প্লেনে উঠিয়াই বুদ্ধবাবু দেখিলেন যে সত্যই তাহার পাশের Seat খানিতে কোনও যাত্রী নাই। খালি পড়িয়া আছে। একবার মহাপুরুষের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু তখনও পূর্ণভাবে বিশ্বাস হইল না। প্লেনে করিয়া তিনি সুদুর আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। প্রথম halting station—করাচী। করাচী Airport এর lounge-এ বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন বুদ্ধবাবু দেখিলেন যে তাহার সম্মুখে একটি চেয়ারে Aircraft-এর পোষাক পরিধৃত একজন সাহেব, সেও অতি

চিন্তামগ্নভাবে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধবাবু উঠিয়া গিয়া সেই সাহেবটির সঙ্গে আলাপ করিলেন। কথায় কথায় সাহেব বলিলেন যে, ভারতের হিমালয় পাহাড়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং mysterious সাধুসন্তের সন্ধানেই তিনি মাঝে মাঝে ভারত ভ্রমণে আসেন। কথা প্রসঙ্গে সাহেব আরও বলিলেন যে তাহার পিতামহ যখন ভারতে ছিলেন তখন একজন মহাত্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার নাতি Air Pilot হইবেন এবং তাহা সত্য হইয়াছে। তবে এ কথাও মহাত্মা বলেন যে Plane crash-এ তোমার নাতির জীবনাবসান ঘটিবে। বয়স, সময়, তারিখ অনুযায়ী এই flightটাই মহাত্মা নির্দেশিত flight. Pan-American Airlines-এর যে Planeটা দাঁড়াইয়া আছে, সাহেব ওটারই co-pilot এবং সেই planeটিতেই বুদ্ধবাবুও যাইতেছেন। এই ঘটনা শোনার পর বুদ্ধবাবুও তার জীবনের ঘটনা বলিলেন। হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা গেল যে flight-এ দুজনেই যাইতেছেন সেই flight-এর বিষয়েই মহাত্মা নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব এখন কি করা যায়! পরামর্শ, চিন্তা করিয়াও কোনও পথ পাওয়া গেল না। পার্থিব মানব সমাজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কোথাও বিশ্বাস করে না। সুতরাং যা হইবার হইবে। দেখা যাউক।

নির্দ্দিষ্ট সময় মত Karachi হইতে Pan-American Airlines-এর প্লেন ছাড়িয়া দিল। তখন ছিল গভীর রাত্রি। আকাশে প্লেন বেশ কিছুক্ষণ উড়িবার পর হঠাৎ বুদ্ধবাবুর পাশের পাশে উপবেশিতা এক মহিলা যাত্রী একটু উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখুন! কেমন Sunrise হচ্ছে!!" —গভীর রাত্রিতে প্লেন ছাড়িয়াছিল, তায় আবার প্লেন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তবে সূর্যোদয় কেমন করিয়া সম্ভব? এ কথা মনে হইতে ভদ্রমহিলার কথানুযায়ী বুদ্ধবাবু ঐ দিশায় জানলার বাহিরে দৃষ্টি দিতেই দেখিলেন যে প্লেনের wing-এ আগুন লাগিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ অন্য দিকের জানলায়ও দৃষ্টি পড়িল— দুর্ভাগ্যের আর সীমা নাই—অন্য wing টিতেও আগুনের ঝলক আসিতে লাগিল এবং পূর্ণমাত্রায় আগুন ধরিয়া গেল। মৃত্যু আসন্ন

বুঝিয়া বুদ্ধবাবু প্রমাদ গুনিলেন—এরই মধ্যে announcement হইয়া গেল যে Plane crash landing করিতেছে—মরুভূমির উপরে—অর্থাৎ আর কোনও উপায় নেই। সবাই belt বাঁধিয়া ফেলুন। সকল যাত্রীর মধ্যে আতঙ্কের অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। কিন্তু এরই মধ্যে বুদ্ধবাবুর সেই মহাত্মার চেহারা মনে পড়িল। তিনি সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে দ্রুত প্রণাম করিয়া যেমনি পার্শ্ববর্তী seat এর প্রতি নজর করিলেন, তখন বুদ্ধবাবু দেখিলেন হিমালয়ের সেই মহাকায়া শিবস্বরূপ মহাত্মা তাহার পার্শ্ববর্তী seatটি দখল করিয়া বসিয়া আছেন। মহাত্মার দৃষ্টি স্থির অটল। কোনোভাবের লেশমাত্র ছাপ তাহার মুখগুলে নাই। মহাত্মা দর্শন করিতে করিতেই বুদ্ধবাবুর প্লেনটি বিকট আওয়াজ করিয়া মরুভূমিতে রাতের অন্ধকারে crash landing করিয়া ফেলিল। তখন প্রায় সমগ্র Plane জুড়িয়া আগুন আর আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই rescue দল বিধ্বস্ত মানুষগুলিকে plane হইতে বাহির করিতে লাগিল, বুদ্ধবাবু অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তারপর যখন বুদ্ধবাবুর জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন যে বেইরুট হস্‌পিটালের বেডে শায়িত আছেন। ওঁনার আশে পাশে আরও সব যাত্রীরা severely injured অবস্থায় রহিয়াছেন, কেউ বা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। তবে তখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই। বেইরুটে কিছুকাল চিকিৎসাধীন থাকিতে হইল বুদ্ধবাবুকে। তাহার মুখমণ্ডলের সমস্ত মাংস আগুনের তাপে ঝলসিয়া গিয়াছিল; সেগুলি ওখানকার ডাক্তারেরা অতিসুন্দর plastic surgery করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান সমস্যা হইল যে বুদ্ধবাবুর পাঁজরা এবং মেরুদণ্ড এমনভাবে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে ডাক্তাররা গলা হইতে কোমর পর্যন্ত একখানি লোহার খাঁচা set করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত তিনি সোজা হইয়া বসিতে পারিতেন না। এই খাঁচা লইয়াই বুদ্ধবাবু সুস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর বহুবৎসর গত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধবাবু সে অবস্থায় যোগা Classও লইতেন। কিন্তু মন তার শান্ত ছিল না। কিছুকাল পর তার প্রায়ই

মনে হইত সেই মহাত্মার মুখমণ্ডল এবং ভবিষ্যদ্বাণী। বুদ্ধবাবু মনে মনে ভাবছিলেন যে তিনি তো একপ্রকার disabled man হইয়া গিয়াছেন তবে তাঁহার দ্বারা ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের আর কোন কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব? এই ভাবিতে ভাবিতে রাতে তিনি নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—একজন শিবরূপ ব্যক্তিত্ব বলিতেছেন—"কেদারনাথে যাও। স্বয়ং বাবা কেদারনাথ তোমায় কৃপা করিবেন। কেদারে গিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দিরে পূজা দিও। তুমি রোগমুক্ত হইবে।"—নিদ্রাভঙ্গের পর বুদ্ধবাবু হতবাক। ঐ দিন হইতেই কেদার যাওয়ার তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। বহুজনে বলিলেন, কেদারের পথ অতি দুর্গম; এ অবস্থায় আপনি যাবেন কি করে? ইত্যাদি। তথাপি আত্মবিশ্বাসে নির্ভরশীল বুদ্ধবাবু কেদারনাথ যাত্রা করিলেন—একাকী। বহুকষ্টে কেদারে তিনি পৌঁছিলেন। কেদারনাথে পৌঁছিয়া স্বপ্নাদিষ্ট আদেশ অনুযায়ী বুদ্ধবাবুন্দ কেদার কুণ্ডে স্নান করিলেন। স্নাত হইয়াই বুদ্ধবাবুর মনে হইল দেহের মধ্যে খট্ করিয়া কি যেন শব্দ হইল। কুণ্ড হইতে উঠিয়া তাহার খুব সতেজ বোধ হইতে লাগিল। কুণ্ডের পাশে লোহার খাঁচাটি খুলিয়া চিরতরে বিসর্জন দিয়া বুদ্ধবাবু কেদারের মন্দিরে গিয়া পূজা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন। ঐদিন হইতে তাহার খুব সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। কেদার হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বুদ্ধবাবু X-Ray করাইয়া দেখিলেন যে তাহার কোনও হাড়ই ভাঙা নেই। সবই পূর্বাপর হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য!!!

পরবর্তীকালে বুদ্ধবাবু তাহার নিউ আলিপুরের Yoga Cure Institute এ রুদ্রশিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবের আরাধনা করিতেন। বুদ্ধবাবু, ভারতের মুনিঋষিদের সম্পদ যোগাসন পদ্ধতিগুলি যে সুস্বাস্থ্য ও রোগমুক্তির এক অনন্য উপায় এবং ইহা এক সুপ্রাচীন অতিবিজ্ঞান, তাহা Europe ও America-য় প্রচার এবং প্রমাণ করিয়া অভূতপূর্ব খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন।

অভিজ্ঞা

এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধনী পরিবারের পিসিমা ছিলেন ইনি—শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী। বাল বিধবা হইয়াছিলেন বলিয়া পিতৃগৃহেই ছিল তাঁহার নিবাস। পিত্রালয়ের কর্মচারীবৃন্দের কর্মকে দেখাশোনা করা, সমস্ত বিষয়ের খবরাখবর লওয়া ইত্যাদি ছিল তাঁর কর্ম। পিসিমায়ের দাপটে গৃহের সবাই তটস্থ। এঁদের গৃহে গৃহপালিত কয়েকটি গাভী ছিল। সেই গৃহপালিত গাভীগুলির দায়িত্বভার বহন করিত পুরাতন প্রৌঢ় গোয়ালা রামলগন। রামলগন ছিল বিহারী। সে বাংলা ভাষা তো একেবারেই বোঝে না, তার উপর পিসিমায়ের পূর্ব বঙ্গীয় চলতি ভাষা তাহার কিছুই বোধগম্য হইত না। একদা খুব মজার একটি ঘটনা ঘটিল।

গৃহের একটি গাভী সন্তানসম্ভবা হইল। সন্তানসম্ভবা বলিয়া পিসিমা কয়েক মাস ধরিয়া গাভীটির প্রতি বিশেষ সেবা যত্নের ভার রামলগনকে দিয়াছিলেন। অতুলনীয় সেবা যত্নের ফলে গাভীটির আরও নধরকান্তি চেহারা হইয়াছে। ক্রমশঃ দিন অতিবাহিত হইয়া আসিতেছে! অবশেষে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দিন আসিল। পশুচিকিৎসক দুপুরে দেখিয়া গিয়াছেন, তিনি গাভী শিশুর জন্মিবার সময়ও একরকম বলিয়া গিয়াছেন। দুপুর হইতেই ঐ সকল সংবাদে পিসিমার মনে উদ্বেগ শুরু হইয়া গিয়াছে। সেই বিকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত গৃহের দালানে পিসিমা উপবেশিতা। মাঝে মাঝেই রামলগনকে ডাকাইতেছেন ও গাভীটির বিস্তারিত সংবাদ লওয়া চলিতেছে। ঐ দিন রাত্রে পিসিমায়ের এক প্রকার খাওয়া দাওয়াও হইল না গাভীটি কষ্ট পাইতেছে জানিয়া। ক্রমশঃ রাত ঢলিয়া ভোর হইবার পালা; সমগ্র রাত্র ধরিয়া পিসিমা গাভীর উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বোধহয় তাঁহারই

প্রার্থনায় ভগবান প্রসন্ন হইয়া অবশেষে গাভীটিকে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিলেন। পিসিমা বসিয়া ছিলেন, এমন সময় রামলগন আসিয়া সুসংবাদ দিল—"মাঈ, গৌ কা বাছুর হো গিয়া।"

রামলগনের কথা শুনিবামাত্রই পিসিমা অত্যন্ত তৎপর হইয়া বলিলেন —"বাছুর হো গিয়া!!!"

"ছেলে হুয়া না মেয়ে হুয়া?"

রামলগন— "বাছুর আচ্ছা হৈ মাঈ।"

পিসিমা (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) বলিলেন—"অরে রাম, আমি বোলতা হুঁ কি মাদী হুয়া না মদ্দা হুয়া?"

রামলগন—"হাঁ মাঈ, মা ঔর বাছুর দোনো আচ্ছা হৈ।"

যখন কিছুতেই রামলগনকে সঠিক কথা বুঝাইতে পারিলেন না তখন পিসিমা বলিলেন—"ধুর্ রামগলন, তোর মাথামে কুছ নেহী হৈ, অরে তুম বোলো কি "হম হুয়া না তুম হুয়া?"

হ্যাঁ, এইবার রামলগন বুঝিতে পারিয়াছে যে এতক্ষণ পিসিমা কি জানিতে চাহিতেছেন।

একটু হাসিয়া একটি প্রণাম করিয়া অবনত মস্তকে রামলগন বলিল— "মাঈ, আপ হী হুয়া হৈ।"

এই কথা শুনিয়া পিসিমা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া সমগ্র দিনের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নিজ ঘরে বিশ্রাম লইতে চলিয়া গেলেন।

অবধারিত

মধু মিঞা নামে মানুষটির চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের সমাজের নিয়মানুযায়ী সে বহু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তার প্রথম বিবাহ হয়, আর মধ্যের বৎসরগুলিতে ১৬-১৭টা বিবাহ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু একটিও টেঁকেনি। আজ তার বয়স ৫৪ বৎসর। সর্ব কনিষ্ঠা বউ তার ঘরে এল কয়েক বৎসর পূর্বে। এরপর আর বউ পরিবর্তন হয়নি; আজ পর্য্যন্ত হালিমা বিবির সঙ্গেই মধুমিঞা ঘর করে চলেছে।

আমার জীবনে চলার পথে এই দম্পতীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই অল্পদিনের। এই অল্প সময়ের পরিচয়ের মধ্যেই সমাজের সামাজিক পরিণতির এক মুখ্য স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সেই কাহিনীই লিপিবদ্ধ করলে একটা গল্পের আকার হয়ে পড়ে।

মধু মিঞার দারিদ্র্যের সংসার। তার সংসারের দারিদ্র্যের কারণ সে নিজেই। যা রোজগার, তার চেয়ে অধিক খরচ। সব পয়সা মদ-জুয়া আর মেয়ে মানুষের পিছনে খরচা হয়ে যায়। মধুমিঞা রিক্সা চালক। তার সংসারে তিনটি সন্তান—দুই কন্যা ও এক পুত্র। সংসারে অভাবের দরুন হালিমা বিবিকেও কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করতে হয়। বলতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে হালিমা বিবির জন্যেই সংসারটা আজও সচল হয়ে আছে। হালিমা পতিব্রতা সততা ও বিশ্বস্ততার দরুন বাহিরের কর্মজীবনে তার বেশ সুনাম। হালিমা তার স্বামীকে একটা ভ্যান গাড়ী ও রিক্সা নিজের কষ্টের উপার্জিত ধন দিয়ে খরিদ করে দিয়েছে। তবুও সংসারে তার সচ্ছলতা নেই। সকল দারিদ্র্যতাকে উপেক্ষা করেও পতিব্রতা রমণীর স্বামীর প্রতি কি অবিচল ভক্তি! সকল দোষত্রুটি মার্জনা করে হালিমাই সংসারটি চলমান

করে রেখেছে। হালিমা বিবি পরিপূর্ণ অশিক্ষিত, তবুও তার বিবেক সদাই সৎ চিন্তায় মগ্ন থাকে। জাগতিক সংসারই তার নিকট একমাত্র জীবন্ত সত্য। সেই জীবন্ত সত্যকে কেন্দ্র করেই হালিমার জীবন অতিবাহিত হয়। দাম্পত্য কলহ তার জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই সকল দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করেই হালিমার আমার নিকট আগমন। আমাকে তারা দাম্পত্য কলহের বিচারপতির আসনে বসাইয়া দিয়েছিল।

একদিন হঠাৎ আমার দরজায় করাঘাত। তারপর আমার ঘরে কলিং বেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি হালিমা বিবি দণ্ডায়মান; তার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; যেন বিষম কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ব্যাপার? তোমার কি হয়েছে?"

হালিমা—"ব্যাপার খুব ঘোরালো মা, মধু আবার বিয়ে করতে চলেছে আর এইবার তার তিনটে বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলছে।"

আমি—"সে কি! হঠাৎ এমন কথা মধু তোমায় বলছে কেন?"

হালিমা—"গতকাল রাত্রে এসে আমায় মধু বলল, চারশ টাকা দে—আরও একটা গাড়ী কিনবো। আমি বললাম যে জায়গা দেখে ঘর বাঁধব বলে ব্যাঙ্কে টাকা রাখছি, আর তুই সে টাকাও আমার কাছে চাইছিস? কেন? মায়ের নিকট সব আছে। আমি আর তোকে এক পয়সাও দেবো না। আর আজ সকালে আমায় বলছে যে, ও একটা মেয়ে ঠিক করেছে, টাকা না দিলে আবার বিয়ে করবে।"

অতি সহজ সরল প্রাণ এই হালিমা বিবি। তার সমস্ত কথাবার্তা শুনে আমি যা বুঝতে পারলাম, তা সে কিছুতেই বুঝলো না। এ কখনও সম্ভব? একটা মানুষ বিয়ে করতে যাবে, সঙ্গে তার বালবাচ্চা কাঁধে করে? আমার খুব হাসি পেলো। আমি বললাম—"তুমি মধুকে এক পয়সাও দিও না, দেখো না ও কি করে?"

হালিমা—"আমি ওকে বলেছি গিয়ে যে তোকে আর এক পয়সাও দেবো

না, আর, তুই যেখানে খুশী চলে যা; তবে বাচ্চাদের নিতে দেবো না; পরে আর কোনও দিন আমার কাছে আসবি না। যাবার আগে কাগজে লিখে সই করে দিয়ে যা যে 'তোর বাচ্চা আমার হবে।"

কি সাংঘাতিক কথা "তোর বাচ্চা আমার হবে।"

হালিমা চলে গেলে পরে আমি তো হেসে বাঁচিনা। আর ঘটনার সাক্ষী হয়ে আমাকেও তো সই করতে হবে। এই হল আমাদের বর্তমান অশিক্ষিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। নিজেরাই নিজেদের বিচার সভা সৃষ্টি করে, নিজেরাই আস্থাবান মানুষকে বিচারপতি বানিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নেয়। এই শ্রেণীর মানুষেরা লুকিয়ে কোনও কাজ করে না। ভদ্র অভদ্র আচরণ সম্পর্কে তাদের কোনও বোধই প্রবুদ্ধ হয়নি। তবুও এরা মানুষকে ভালবাসতে জানে, যেমন এরা আমাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দুই দিয়েছিল। হালিমা বিবিকে আমি একদিন বলেছিলাম—"রোজ রোজ এমন ঝগড়া কর তুমি, বরং মধুকে তালাক্ দাও।" তাতে হালিমা বললে—"ও অধর্ম আমি করতে পারব না। কর্ম খারাপ করেছিলাম তাই আজ স্বামীর হাতে মার খেয়ে মরছি। এ সহ্য করতে রাজী আছি তবে তালাক্ দিতে পারব না, তাতে যে আমার চরিত্রহানি হবে। হাজার হোক সেতো আমার স্বামী।"

হালিমার মুখে ধর্মের বাণী শুনে আমিও চমকিত। পার্থিব দৃশ্যমান জগতে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব কথা অচল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ঋষি-মুনি, রাজার আমলে হালিমার মুখের কথা গ্রাহ্য করা হত। নবযুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার যুগে নির্যাতন বিষয়টিই অন্যায় বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও হালিমার মতো মানুষের সে বিষয় সম্বন্ধে কোনও বোধ নাই। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্মফল ভোগ করার জন্যেই জন্মজন্মান্তর মানুষ কালচক্রে ঘুরে মরছে। কিন্তু এক অশিক্ষিতা নারীর নিকট এত বড় কথা আশা করা দুর্লভ মনে করি। শিক্ষিতজনেরা স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হলে

স্বার্থের খাতিরে যে যার পথ দেখে নেয়। কর্ম বা কর্মফলের চিন্তা তখন মাথায় থাকে না।

পরবর্তীকালে একদিন আমি হালিমাকে বলি যে "ছেলে বেলায় বাপ-মা মধুকে তেমন ভাল শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেনি তাই আজ ও এমন হয়েছে। যে মানুষের যা স্বভাব হয়ে যায় তা সহজে পরিবর্তন করা যায় না।"

হালিমা বললে—"ও কথা ঠিক নয় মা। কেউ মানুষ হবে না পশু হবে তা মায়ের গর্ভাবস্থাতেই সঠিক হয়ে যায়। আসলে স্বভাব নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে থাকে। কেউ কাউকে মানুষ বা অমানুষ করে দিতে পারে না, মা।"

হালিমার এই শেষ কথা শোনার পর আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঐ এক অবধারিত সত্যের কথা মূর্খনারী হালিমা বিবির মুখে নূতনভাবে শুনে আমি তো অবাক! ওর কথা ফেলে দেবার নয়। মানব জাতির জন্মার্জিত সংস্কারই হল ক্রমবিবর্তন প্রণালীর প্রধান উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য। ইহা অনস্বীকার্য। সত্যিই এই অবাক পৃথিবীর বিস্ময়কর জীবন দর্শন!!

সমাপ্ত

মাতা সর্বাণী ট্রাস্ট হইতে

প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি

ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति

অধ্যাত্ম

अध्यात्म

সত্তা

सत्ता

অনুভব

अनुभव

পরমজ্ঞান

परमज्ञान

প্রকাশ

प्रकाश

সমাধি

समाधि

আরাধনা

নিত্য নব চিরপুরাতন

গানের পরশ

"সর্বাণীমা" বন্দনা

অখণ্ড মহাপীঠ